হাত বাড়ালেই

বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪

সুবিধা

Suvida

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

দাম মাত্র দশ টাকা

10

পুজোয় পাঁচ

এবার পুজোর মরসুমের জন্য রইল
পাঁচটি উপাদেয় গল্প

রূপক সাহা, সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপ ঘোষাল, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত

- উৎসবের রান্না নানারকম
- শব্দ যখন যন্ত্রণা: তুমি মা
- ডাক্তারের চেম্বার থেকে : ব্যথা নিয়ন্ত্রণ
- নায়িকা সংবাদ : পোশাকি বাহার

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

সূচিপত্র

চিঠি পত্তর	৪
শব্দজব্দ	৪
সম্পাদকীয়	৫
কথা ও কাহিনি ১	৬
হেঁশেল	১২
তুমি মা	১৫
কবিতা	১৭
কথা ও কাহিনি ২	১৮
পোশাকি বাহার	২২
কথা ও কাহিনি ৩	২৪
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	২৯
বিশেষ রচনা	৩১
কথা ও কাহিনি ৪	৩৪
কথা ও কাহিনি ৫	৩৮

কথা ও কাহিনি

৫ টি ছোট গল্প

রূপক সাহা, সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত

৩১
বিশেষ রচনা
লক্ষ্মী সোনা

২৯ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
ব্যথা নিয়ন্ত্রণ

তুমি মা
১৫
শব্দ যখন যন্ত্রণা

পোশাকি বাহার
২২
নায়িকা সংবাদ

হেঁশেল ১২
উৎসবের ভোজ

নলজাতক

নলজাতক নিয়ে আপনাদের গত সংখ্যার লেখাটি সত্যিই মনে ধরেছে। ভাবতেই অবাক লাগে বিজ্ঞান কীভাবে এগিয়ে গেছে। সন্তানের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও সম্ভব। ঠিক যেন মহাভারতের যুগে আমরা ফিরে গেছি। যেখানে ক্ষেত্রজ সন্তান বা কুঁজোয় সন্তান হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক।

শান্তশ্রী সেনগুপ্ত, লিলুয়া

ব্যয় সাপেক্ষ!

সন্তানহীনতার গ্লানি থেকে অনেকেই নলজাতক পদ্ধতি অবলম্বন করে মুক্তি পাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন এটা কি শুধুমাত্র বিত্তবানদের জন্য প্রযোজ্য? এই পদ্ধতি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ শুনেছি। এ ব্যাপারে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

আনন্দী ঘোষ, শ্যামবাজার

পেতে চাই

আপনাদের 'সুবিধা' পত্রিকায় সন্তানের স্বাস্থ্য ও বড়দের জন্য যে রোগ বিষয়ক লেখা থাকে তা খুবই উপকারী। তবে দুটো জিনিস নিয়ে এখনও লেখা পাইনি। এক সাইনাসাইটিস ও দুই শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি। যদি এ দুই রোগ নিয়ে ও তার চিকিৎসা বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেন তাহলে উপকৃত হব।

শুভেন্দু দণ্ডপাত, উলুবেড়িয়া

মহিলা কেন্দ্রিক ছবি

অভিজিৎ গুহর মহিলা কেন্দ্রিক ছবি নিয়ে আলোচনা পড়ে ভাল লাগল। তবে এটা এখনও স্বীকার করতে হবে, টেলিভিশন-এর পর্দায় মহিলাদের যতটা গুরুত্ব, বড় পর্দায় এখনও ততটা হয়নি। তবে বাড়ছে। এটাই আশার আলো।

বিনীতা মল্লিক, কাঁকুরগাছি

মরদানি ও রানি

সম্প্রতি রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত মরদানি ছবি দেখে আবার মনে হল অভিজিৎ গুহ নারী কেন্দ্রিক ছবি সম্পর্কে যে উৎসাহব্যঞ্জক লেখা লিখেছেন তা যথাযথ। 'মরদানি' ছবিটিতে রানি অসম্ভব ভাল অভিনয় করেছেন, এবং পরিচালক প্রদীপ সরকার সমাজের একটা সত্য ছবিও তুলে ধরেছেন। আশা করব ভবিষ্যতে আরও মহিলা কেন্দ্রিক ছবি হবে এবং জনপ্রিয়তা পাবে। ক'মাস আগে দেখা 'কুইন' একেবারে অন্য ধাঁচের ছবি হলেও, এক মহিলার উত্তরণ নিয়েই গল্প। 'টেক ওয়ান'-ও তাই। ভাল মন্দ মিলেমিশে নারী সত্ত্বা নিয়ে ছবি মনে ধরছে দর্শকের।

সুধ বিশ্বাস, বেহালা

আইন ও লগ্নী

মহিলা সুরক্ষা আইন নিয়ে লেখা খুবই সময়োপযোগী। তবে আমার মতে আইন, বিশেষত সামাজিক সমস্যাজনিত আইন, এবং অর্থলগ্নী বিষয়ক পরামর্শ ভিত্তিক লেখা আরও থাকলে পত্রিকাটির কদর বাড়বে।

গোরা বড়াল, সোনার পুর

ভাল গল্প

আপনাদের পত্রিকা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি। এত সুলভে, এত পরিচ্ছন্ন একটি পত্রিকা আপনারা যে কী করে দিচ্ছেন দেখে অবাক হচ্ছি। সম্প্রতি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'তিকিতাকা' মনে ধরেছে। ভাল লাগে এ ধরনের গল্প। ধন্যবাদ সুবিধা।

কৃষ্ণ গড়াই, নরেন্দ্রপুর

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

শব্দজব্দ ২৫

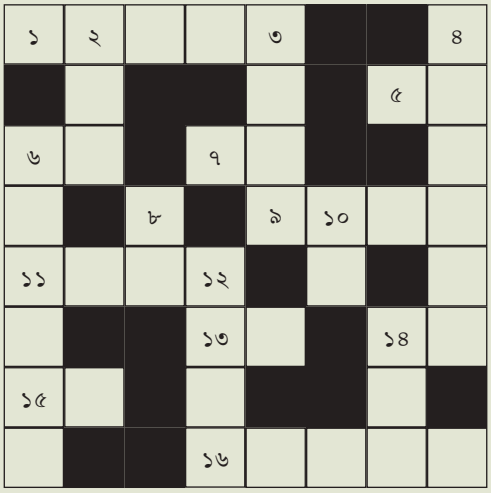

শ্যামদুলাল কুণ্ডু

পাশাপাশি

২। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শিষ্যদের কাছে যে-নামে পরিচিত। ৫। অগ্নিদেবের পত্নী। ৬। দক্ষকন্যা, শিবপত্নী। ৭। শর্মিলা-সৌমিত্র-ছবি বিশ্বাস অভিনীত স্মরণীয় এক ছবি। ৯। এই সেন সাহিত্যিক, অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদনার পর শেষে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর মাসিক ভারতবর্ষের সম্পাদক ছিলেন। ১১। এই হক বাংলাদেশের ডাক্তার ও রাজনীতিবিদ আওয়ামি লিগের সক্রিয় সদস্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাক সেনার হাতে নিহত হন। ১৩। বলি, 'হরিবোল বলিয়া — মারিল ঠোকিয়া' (গোপীচন্দ্র)। ১৪। প্রাচীন বাংলায় শূন্য, 'চাবুক খাইয়া ঘোড়া—এতে উড়িল' (মৈমনসিংহ-গীতিকা)। ১৫। পুং-রূপে এতে ছয়টি আর স্ত্রীরূপে আছে ছত্রিশটি। ১৬। বিশ্বখ্যাত সেতারি, 'অপরাজিত'-র সুরকার।

উপরনিচ

২। '—রে হেরি বাঁকি গেল রেখা, কাঁপি গেল তার হাত'। ৩। পৌরাণিক এক অসুর, যার প্রতি রক্তের ফোঁটা থেকে নতুন অসুরের জন্ম হত। ৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক এই ডক্টর রায়। ৬। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি চার্লস চ্যাপলিনের পর যাঁকে ডি লিট দিয়েছে। ৮। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক পরে ব্যাঙ্গচিত্র শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এই রায়। ১০। ধনদেবী, দুর্গার পরেই যাঁর পুজো। ১২। 'মনসামঙ্গল'-এর চাঁদ সদাগরের পুত্র, বেহুলার স্বামী। ১৪। সপ্তম শতাব্দীর গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবত গুপ্তবংশের শেষ রাজা।

সমাধান শব্দজব্দ ২৫

শ্রী	শ্রী	ঠা	কু	র			নী
	ম			ক্ত		স্বা	হা
স	তী		দে	বী			র
ত্য		চা		জ	ল	ধ	র
জি	ক	রু	ল		ক্ষ্মী		ঞ্জ
ৎ			খি	ল		শ	ন
রা	গ		ন্দ			শা	
য়			র	বি	শ	ঙ্ক	র

পুজো মানে বাঙালির জীবনের হাই পয়েন্ট। পুজোর মুখ চেয়ে সারা বছর বসে থাকে আপামর বাঙালি। পুজো মানে আনন্দ, ব্যবসা, একে অন্যের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, প্রতিযোগিতা, আকর্ষণ, সৌন্দর্য ও সর্বোপরি ভক্তি। দুর্গাপুজো প্রধানত অশুভ শক্তি নিধনের প্রয়াস। এবং আশ্চর্যের বিষয় আমাদের ধর্মে বারবার দেখা গেছে, অশুভ শক্তি নিরস্ত হয়েছে নারীর রুদ্রমূর্তির কাছে। তাহলে কি সময় এসেছে কোমল, কমনীয় রূপ ছেড়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করার? তবেই কি ধরায় শান্তি, মৈত্রী ও ভালবাসা আসবে?

নীতিকথা ছেড়ে যাওয়া যাক কিছু আনন্দের কথায়। এবার সুবিধা পত্রিকায় থাকছে পাঁচ পাঁচটি গল্প, পুজো বা উৎসবের মরসুমকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার জন্য। আমার কাছে পুজোর চারদিন তো বটেই, ঠিক পুজোর শেষে অর্থাৎ বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত একটা ছুটি ছুটি মুড থাকে। পুজোর চারদিন, হই হট্টগোলের মধ্যে কিছুটা সময় কেটে গেলেও, দশমীর পর কেমন একটা বিষাদ নেমে আসে। এই সময়ে আমি বই পড়ি। পুজো সংখ্যার গল্প তখন আমার বিষাদ কাটানোর উপায় হয়ে ওঠে। গল্প থেকে পেয়ে যাই ছবি বা টেলিফিল্ম করার উপাদানও। এ বছর সুবিধার জন্য লিখেছেন পাঁচজন, রূপক সাহা, সর্বাণী মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রচেত গুপ্ত এবং প্রতিটি গল্পই ভিন্ন স্বাদের।

লক্ষ্মীপুজো হয় ঘরে ঘরে। বৃহস্পতিবার করে যে বাড়িতে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া হয়, সেখানে যেমন কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো হয় আবার যেখানে নিয়মিত পুজো হয় না, সেখানেও এ দিনে লক্ষ্মীর সাধনা চলে। লক্ষ্মী আমাদের খুবই প্রিয় দেবী। কাউকে ভাল বলতে 'লক্ষ্মী সোনা' কথাটি খুবই প্রচলিত। এই 'লক্ষ্মী সোনা'-র বিশ্লেষণ করেছে প্রীতিকণা। পড়ে আপনাদের মতামত পাঠাতে ভুলবেন না।

এবার পুজোর পর দিন কয়েকের জন্য ঠিক করেছি উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যাব। জঙ্গল, পাহাড় আর ভূতের সন্ধানে। আপনারা কে কেমন পুজো কাটালেন জানাবেন। আপনাদের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট পঞ্চাশ টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

৬টি সংখ্যা মাত্র ৫০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

কথা ও কাহিনি -১

অসুখের সুখ

রূপক সাহা

Suvida

সুবিধা ৬

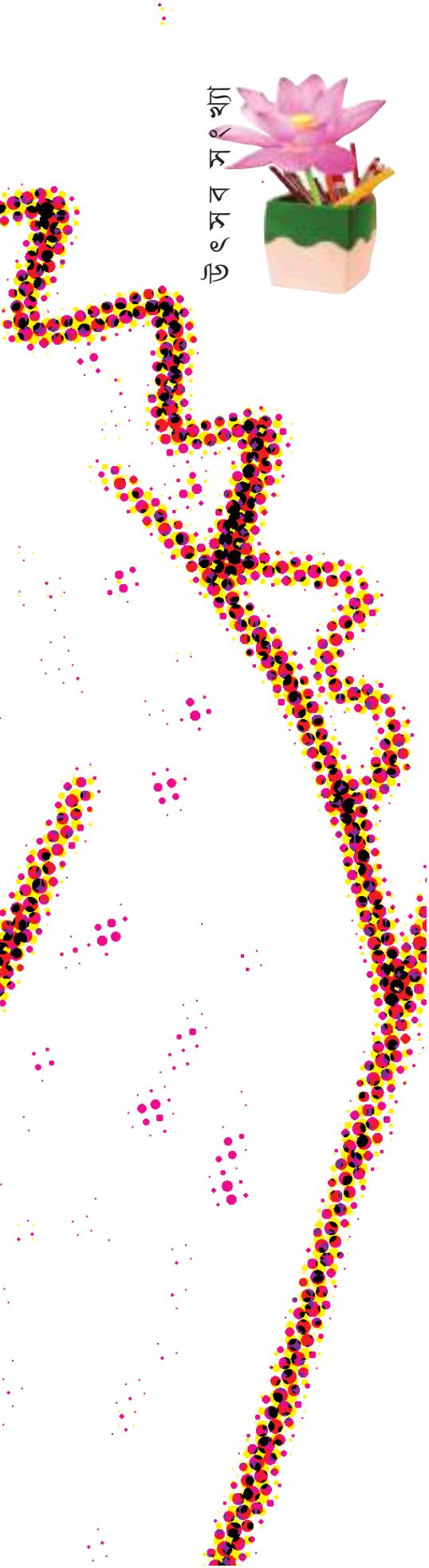

সকালে বাজারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরচ্ছি, এমন সময় ভায়রাভাই অমলেশের ফোন, 'দাদা, দিতি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি কি একবার আসতে পারবেন?'

দিতি আমার ছোট শালী, থাকে গড়িয়ার দিকে। বয়স বেশি নয়, মধ্য তিরিশ হবে। কিছুদিন বাদে বাদেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুরু হয়েছিল সুগার ধরা পড়ার পর। পা ঝিনঝিন করছে, যখন-তখন ঘুম পাচ্ছে। এখন নিত্যনতুন উপসর্গ। কখনও দাঁতে ব্যথা, কখনও কোমর অথবা মাথায়। এই কয়েকদিন আগেই ওর তলপেটে ব্যথার কারণে অমলেশকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে ডাক্তারের কাছে। ছ'রকমের টেস্ট করিয়েও কোনও রোগ ধরা পড়েনি। আমরা, আত্মীয়-স্বজনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। ফের অসুস্থতার খবর দিচ্ছে অমলেশ। ওর গলায় স্পষ্টতই উদ্বেগ। আবার কী হল?

অমলেশ ধরা গলায় বলল, 'আর পারছি না দাদা। ব্যাঙ্কে ইয়ার এন্ডিংয়ের কাজ চলছে কাল রাতে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। হঠাৎ জোজোর ফোন পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি, পেট চেপে ধরে দিতি বিছানায় ছটফট করছে। বাঁ দিকে নাকি মারাত্মক ব্যথা। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। আজ বোধহয় অফিসেও যাওয়া হবে না। কী করব, বুঝতে পারছি না।'

'যে ডাক্তার ওকে দেখছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে?'

'সকালে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, এমন তো হওয়ার কথা নয়। ওষুধের কোর্স কমপ্লিট করার পর আমার কাছে একবার নিয়ে আসবেন। কিডনিতে ইনফেকশন বা স্টোন হতে পারে। আল্ট্রা সোনোগ্রাফি অথবা সিটি স্ক্যান করাতে হবে।'

'ব্যথাটা কি কোমরের কাছে হচ্ছে?'

'সেটাই তো ভাল করে বলতে পারছে না। এক একবার একেকটা জায়গা দেখাচ্ছে।'

শুনে বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

আমি থাকি নাকতলায়। গড়িয়া এমন কিছু দূরে নয়। বাজারে যাওয়া মাথায় উঠল। স্বাতীর সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়, তখন দিতি টিন এজার, ক্লাস নাইনে পড়ে। সেই সময় ফুটফুটে একটা মেয়ে। সবার আদরের। ওরা চারবোন। স্বাতী সবার বড়। মেজ নীতি, আর সেজ প্রীতি। সবারই ভাল ভাল পরিবারে বিয়ে হয়েছে। নীতির বর রাজা চার্টাড অ্যাকাউনট্যান্ট। ওদের বাড়ি শ্যামবাজারে। প্রীতির বর অমৃতাংশু ডিভিসি-র পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। ওরা থাকে ধানবাদে। ব্যাঙ্ক চাকুরে অমলেশ আগে থাকত পৈতৃক বাড়ি যাদবপুরে। কিন্তু, চার বছর আগে অমলেশ ফ্ল্যাট কিনে ওকে নিয়ে গড়িয়ার দিকে উঠে গিয়েছে। আর তারপর থেকে কোনও না কোনও অসুখে ভুগছে দিতি। শরীরের সর্ব অংশে ওর রোগ।

দিতির যত আবদার আমার কাছে। পান থেকে চুন খসলেই গড়িয়ায় আমার ডাক পড়ে। কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিকে পঁয়ত্রিশ বছর সাংবাদিকের চাকরি করেছি। মাত্র এক বছর হল রিটায়ার্ড। আমার হাতে অখণ্ড সময়। আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে আমার কাছে ছুটে আসে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একটা সময় আলাপ ছিল। সে পুলিশ হোক, সরকারি কর্তা, উকিল অথবা ডাক্তার। সাংবাদিকতার পেশা নিয়ে একটা সময় এত ব্যস্ত ছিলাম, তখন কাছের মানুষদের সময় দিতে পারিনি। এখন কিছু করতে পারলে ভাল লাগে। অমলেশ ডেকেছে, তাই যেতে হবে। বাজারের ব্যাগ তুলে রাখছি দেখে, স্বাতী কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলে গো?'

বললাম 'অমলেশ'।

কী বলল, খুঁটিয়ে জানার পর স্বাতী ফুট কাটল, 'আমি জানতাম। তোমার আদরের শালী শিগগির অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'কী করে জানলে?'

'পুজোর ছুটিতে নীতি আর রাজা এবার রাজস্থান বেড়াতে যাচ্ছে। খবরটা বোধহয় দিতি কারও কাছ থেকে শুনেছে। ও তো কারও ভাল সহ্য করতে পারে না। অমলেশ যতদিন না ওকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে, ততদিন ও সুস্থ হবে না।'

বললাম, 'তা হয় নাকি? তোমার যত উদ্ভট কল্পনা। মেয়েটা নিশ্চয়ই পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। না হলে সারা রাত্তির ছটফট করবে কেন?'

'অ্যাক্টিং। আমার ছোট বোনকে তো আমি ভালমতো চিনি। ও তোমরা... পুরুষরা বুঝতে পারবে না।'

স্বাতী আর কোনও কথা না বলে ফের কিচেনে ঢুকে গেল। এর আগেও ও এই

ধরনের কথা বলেছে। আমি পাত্তা দিইনি। আমাদের ছেলে বুবুন ডাক্তার। চাকরি নিয়ে দুবাইয়ে চলে যাওয়ার পর দিতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাথাব্যথা, দিনদশেকের জন্য ওকে নার্সিং হোমেও ভর্তি করতে হয়েছিল। সেইসময় স্বাতী একবার বলেছিল, 'মাথাব্যথা না ঘোড়ার ডিম। বুবুন বিদেশে চাকরি পেয়ে গেল, ওর সহ্য হবে কেন?' ওদের চার বোনের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল বলেই জানি। রোজ ফোনে কথা হয়। স্বাতীই সবার সঙ্গে যোগাযোগ বেশি রাখে। প্রতি মাসে হাজার দুয়েক টাকা ফোনের বিল আমকে মেটাতে হয়। মাঝে একবার ল্যান্ডলাইন কেটে দেওয়ার কথা তুলেছিলাম। শুনে ফুঁসে উঠেছিল স্বাতী, 'আমার জন্য তো তোমার অন্য কোনও খরচা নেই। না শাড়ি, গয়না অথবা সিনেমা। বাড়িতে বোর হয়ে গেলে কখনও কখনও বোনদের ফোন করি। সামান্য সেই বিলটুকুও তুমি মেটাতে পারবে না?

দাম্পত্য কলহ থামিয়ে দিয়েছিল আমার মেয়ে রুশাতি। সল্টলেকের একটা নামী সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকরি করে। ও বলেছিল, 'মায়ের ফোনের বিল তোমাকে দিতে হবে না বাপ্পা। প্রতিমাসে অন লাইনে আমি পাঠিয়ে দেব। এ নিয়ে আর অশান্তি করো না।'

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করার সময়ই মনে হল, পেট্রোল নেই। বান্টি সিনেমার কাছে পেট্রোল পাম্পের দিকে এগোতেই মোবাইলে ফের অমলেশের ফোন, 'দাদা, আপনি কদ্দূর?'

'মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'বাড়িতে আসার দরকার নেই। দিতিকে আমি নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানেই চলে আসুন।' বাইপাসের ধারে নামী এক নার্সিং হোমের কথা বলল অমলেশ।

নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু হয়েছে। না হলে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার দরকার হত না দিতিকে। শুনে আমার খুব খারাপই লাগল। পেট্রোল ভরে তাড়াতাড়ি বাইপাসের দিকে গাড়ি ছোটালাম। ডাক্তার কী বলবে, কে জানে? মেয়েটার কপালে সুখ বলে কিছু নেই। মাত্র উনিশ বছর বয়সে আমরা ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। দিতি তখন কলেজে পড়ে। বিয়ে করতে চায়নি। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রী সংবাদ দেখেই অমলেশদের সঙ্গে যোগাযোগ। অমলেশকে দেখে আমাদের সবার ভাল লেগে গিয়েছিল। তখন ভাবতেও পারিনি, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দিতি মানিয়ে নিতে পারবে না। আগে ও প্রকাশ্যেই বলত, তিন জামাইবাবুর তুলনায় অমলেশ নাকি কিছুই না। শ্বশুর-শাশুড়িও ব্যাকডেটেড। স্বাতীকে প্রকাশ্যেই দিতি তখন বলত, 'তোদের তো আর শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘর করতে হয় না। আমার প্রবলেম তোরা বুঝবি কী করে?'

অমলেশ খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। তাই ওদের বিয়েটা এখনও টিকে রয়েছে। এক একসময় দিতি এমন সব আব্দার করে, যেন এখনও বাপের বাড়িতেই আছে। টিটো যখন ওর পেটে এল, তখন হঠাৎ জেদ ধরে বসল, যে নার্সিং হোমে মেজদি... অর্থাৎ কি না নীতির বাচ্চা হয়েছে, সেখানেই নিয়ে যেতে হবে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ধাক্কা। ওর শাশুড়ি তখন আমার কাছে মৃদু অনুযোগ করেছিলেন, 'কী অন্যায় জেদ, বলো তো বাবা।' প্রথম সন্তানের আশায়, সামর্থের বাইরে গিয়েও অবশ্য অমলেশ দিতিকে ভর্তি করেছিল সেই নার্সিং হোমে। জোজো জন্মানোর পর খুশিতে সবাই ভুলে গিয়েছিলেন ওর জেদের কথা। সেই জোজোর বয়স এখন দশ বছর হতে চলল। দিতি প্রায়ই ওকে ঠেস মেরে বলে, 'পারবি বুবুন দাদার মতো বিদেশে যেতে?' জোজো এখন পার্ক সার্কাসের এক নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ওকে স্কুলে ভর্তি করার সময়ও দিতি অশান্তি করেছিল, নীতির ছেলে টিটো যে স্কুলে পড়ত, সেখানেই জোজোকে পড়াবে। মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ। তা সত্ত্বেও, আপত্তি করেননি অমলেশ।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাইপাসের ধারে নার্সিং হোমে পৌঁছে গেলাম। আগে কখনও আসিনি, একেবারে থ্রি স্টার হোটেলের মতো। গাড়ি পার্ক করে লাউঞ্জে যেতেই দেখি, অমলেশ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ও বলল, 'চলুন দাদা, ইউরো সার্জেন বসেন এই গ্রাউন্ড ফ্লোরেই। দিতিকে ওখানেই বসিয়ে রেখেছি। ওর নাম রয়েছে চোদ্দ নম্বরে। বেলা দুটোর আগে ডাক্তার ডাকবেন বলে মনে হয় না। শুনলাম, পেশেন্টদের সঙ্গে উনি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন।'

'ডাক্তারটি কে?'

'ডাঃ অনাদি ব্রহ্ম। চেনেন নাকি তাঁকে?'

নামটা চট করে মনে পড়ল না। ঘাড় নেড়ে না বলে, জিজ্ঞেস করলাম, 'দিতি এখন কেমন আছে?'

'গেলেই দেখতে পাবেন। নার্সিংহোমে আসার আগে সাজতে বসেছিল। আমার পক্ষে আর সম্ভব না দাদা। ডাক্তার-বদ্যি করে লাইফ হেল হয়ে গেল। ওর ট্রিটমেন্টের জন্য কম করে মাসে সাত-আট হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা লাগুক, কিন্তু অসুখ ছাড়বে না কেন?'

হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলল, 'মিঃ লাহিড়ি, আপনি এখানে?'

পিছন ফিরে দেখি, শুভঙ্কর বাগচি। ক্যালকাটা হসপিটালের পিআরও ছিল। খবর দেওয়ার জন্য প্রায়ই ছেলেটা আমাদের কাগজের অফিসে আসত। খবর ছাপিয়ে দিতাম বলে শুভঙ্কর তখন খুব খাতির করত আমাকে। কিন্তু ও এখানে কী করছে? জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'মাস দুয়েক আগে আমি এই নার্সিং হোমে জয়েন করেছি স্যার। বেটার স্যালারি, তাই। তা, কাকে দেখাতে এসেছেন?'

আমি নই, পেশেন্ট আমার এক রিলেটিভ। ডাঃ ব্রহ্মকে দেখাতে চায়। জানাতেই শুভঙ্কর বলল, 'ভাল ডাক্তারের কাছে এসেছেন স্যার। খুব কম ওষুধ দেন। ওর সঙ্গে কথা বলেই পেশেন্ট অর্ধেক ভাল হয়ে যায়। আমাদের সৌভাগ্য, আপনি এখানে এসেছেন। চলুন স্যার, আগে সুপারের সঙ্গে আপনাকে আলাপ করিয়ে দিই। আপনার প্রচুর লেখা উনি পড়েছেন।' খবরের কাগজে চাকরি করলে কত সুবিধে পাওয়া যায়! শুভঙ্কর সুপারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তার পরই ভিআইপি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেল। সুপার নিজে উঠে এসে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডাঃ অনাদি ব্রহ্মের কাছে নিয়ে গেলেন। সত্যিই, অভিজ্ঞ ডাক্তার। ব্যথা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডাঃ ব্রহ্ম অনেক কথা জানতে চাইলেন দিতির কাছে। শুনে বললেন, 'এই ধরনের মারাত্মক ব্যথা যার হয়, সে-ই শুধু বোঝে।' আধঘণ্টার মধ্যে দিতির আল্ট্রাসনোগ্রাফিও হয়ে গেল। রিপোর্ট দেখে ডাঃ ব্রহ্ম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না কিডনিতে স্টোন নেই। তবে...' বলেই চুপ করে গেলেন উনি। তারপর দিতিকে বললেন, 'আপনারা বাইরে গিয়ে ওয়েট করুন। আমি মিঃ লাহিড়ির সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলব।'

শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল অমলেশের। ও কোনও রকমে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমি দিতির হাজবেন্ড। ওর কী হয়েছে, আমায় বলুন। খারাপ কিছু হয়নি তো?'

'হ্যাভ পেশেন্স। যা বলার মিঃ লাহিড়িকে আমি বলে দিচ্ছি। পরে ওঁর কাছ থেকে শুনে নেবেন।'

বয়স হয়েছে, শুনে বুকের ভিতরটা গুর গুর করতে লাগল। দিতির খারাপ কোনও রোগ হল না কি? ক্যান্সার বা ওই ধরনের কিছু? আজকাল তো আগে থেকে ধরাও যায় না। শেষ মুহূর্তে

ডিটেক্টেড হয়। তখন কেমো করারও সময় পাওয়া যায় না। যদি সেরকম কিছু হয়, তাহলে অমলেশ আর জোজোর কী হবে? বাড়ি ফিরে স্বাতীকে বললে তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। এক মুহূর্তে এতগুলো প্রশ্ন আমার মনে পাক খেয়ে গেল। অমলেশ আর দিতি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডাঃ ব্রহ্ম আমাকে বললেন, 'আপনার সিস্টার ইন ল' নিশ্চয়ই জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকেন না।'

দম বন্ধ করে বললাম, 'না।'

'হ্যাজবেন্ডের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কেমন, আমায় আন্দাজ দিতে পারেন?'

বললাম, 'খুব ভাল। আমার ব্রাদার ইন ল' খুব কেয়ারিং।'

'তবুও, ওকে আরও একটু বেশি সময় দিতে বলুন। তাহলেই দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার সিস্টার ইন ল'য়ের কাছাকাছি যাঁরা আছেন, তাঁদের অ্যাটেনশন ড্র করার ইচ্ছেতেই উনি সবসময় অসুস্থতার কথা বলেন। উনি চান, সবসময় ওঁকে নিয়েই সবাই ব্যতিব্যস্ত থাকুন। আসলে এটা অসুখের সুখ। ব্যথার কোনও কারণ নেই। তবুও ওর মনে হচ্ছে, ব্যথাটা হচ্ছে। আপনারা যাঁরা ওর ঘনিষ্ঠ, তাঁরা কি এরকম কিছু কখনও লক্ষ্য করেছেন? একটু ভেবে বলুন তো।'

একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল, বছর তিনেক আগে দিতি হঠাৎ বলেছিল, ওর বাঁ হাতের মাঝের দুটো আঙুল বেঁকে গিয়েছে। আঙুলে ব্যথার কারণেই কোনও জিনিস দুহাতে নামাতে বা তলতে পারছে না। রান্নাবান্না করতে ওর অসবিধে হচ্ছে দেখে দেখতেনেই না। বড় জায়াম্বুর সঙ্গে তোমার এখানেই তফাৎ।'

এসব কথায় অমলেশ এখন আর রাগ করে না। উল্টে, হাফ ছেড়ে ও বলল, 'দাদা, দিতিকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। আমি বরং অফিস চলে যাই। বেলা বারোটার মধ্যে পৌঁছতে পারলে, কামাইটা হবে না। স্কুল থেকে জোজো আসবে বেলা পাঁচটার সময়। তার আগে যেন দিতি বাড়ি চলে যায়।'

নাকতলায় ফেরার পথে গাড়িতে সারারক্ষণ দিতি বকবক করতে করতে এল। শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো কত খারাপ। অমলেশের মদ্যপান ইদানীং বেড়ে গিয়েছে। জোজো পড়াশুনোয় মন দিচ্ছে না। আজকাল ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না। বাড়িতে সবসময় কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে। মেজ জায়াম্বুর বারফাট্টাই আর সহ্য করা যাচ্ছে না। মেজদিরও খুব বাড় বেড়েছে। ছোড়দির সুগার হয়েছে, তবুও স্বীকার করে না। গাড়ি চালাতে চালাতে হাঁ হু করে যাচ্ছি। কে বলবে, এই মেয়েটাই কাল রাতে পেটের ব্যথায় ছটফট করেছে? অসুস্থতার কোনও চিহ্নই নেই চোখ-মুখে। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে দিতি হঠাৎ বলল, 'জায়াম্বু, রাজস্থান জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না? চলুন না, পুজোর ছুটিতে আমরা সবাই মিলে রাজস্থান ঘুরে আসি।'

বাড়ি পৌঁছে হ্যান্ডব্যাগটা সোফায় ছুড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল দিতি। স্বাতীকে দেখে বলল, 'আজ একটু পেঁয়াজ-পোস্ত করিস তো দিদি। কাল রাতে কিছু খাওয়া হয়নি। খুব খিদে পেয়েছে।'

ওঁর এই রোগ সারানোর একমাত্র ওষুধ হল, উনি যাতে নিকটজনদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তার ব্যবস্থা করা। তাহলে দেখবেন, নিজের শরীর নিয়ে উনি আর কমপ্লেন করছেন না।'

অমলেশ রাঁধুনি রাখতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থপেডিক সার্জেনের কাছেও দিতিকে নিয়ে গিয়েছিল। উনি পরামর্শ দেন, অপারেশন করাতে হবে। অপারেশনের দুদিন আগে, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে জোজোর হাঁটুতে মারাত্মক চোট লাগে। অমলেশ তখন ব্যাঙ্কে। জোজোকে দুহাতে তুলে নিয়ে দিতি সেদিন নার্সিং হোমে দৌড়ে ছিল। পায়ে প্লাস্টার নিয়ে জোজো যতদিন বিছানায় শুয়েছিল, দিতি ততদিন আঙুলের ব্যথার কথা তোলেইনি। আশ্চর্য, পরে আঙুলের ব্যথার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল, অপারেশনের আর দরকারই হয়নি।

সেই ঘটনাটার কথা ডাঃ ব্রহ্মকে বললাম। শুনে উনি বললেন, 'আমি তা হলে ঠিক ডায়গনোজ করেছি। ওঁর এই রোগ সারানোর একমাত্র ওষুধ হল, উনি যাতে নিকটজনদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তার ব্যবস্থা করা। তাহলে দেখবেন, নিজের শরীর নিয়ে উনি আর কমপ্লেন করছেন না।'

বাইরে উৎকণ্ঠা নিয়ে অমলেশ আর দিতি দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে ওদের কী বলব, ঠিক কী বলব, ঠিক করে নিলাম। প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটা কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে বললাম, 'খবর ভাল নয় রে দিতি। তোর যা অসুখ, তাতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করে সারানো সম্ভব না। ডাঃ ব্রহ্ম সেই কথাটাই বললেন, তোকে ভাল একজন হোমিওপ্যাথ দেখাতে হবে। দেরি করা যাবে না। নাকতলায় চল। বাড়িতে গিয়ে ভাবতে হবে, কার কাছে তোকে নিয়ে যাওয়া যায়।'

শুনে দিতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে অমলেশকে বলল, 'তোমায় বলেছিলাম না, এই ডাক্তারটা দারুণ। ভাগ্যিস, বড় জায়াম্বু সঙ্গে ছিল। তুমি নিয়ে এলে উনি এতক্ষণ ধরে আমায়

স্বাতী নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ডাক্তার কী বলল রে?'

'অত বড় ডাক্তার... রোগই ধরতে পারল না।'

শ্লেষ মাখানো গলায় স্বাতী বলল, 'পারবে কী করে? তোর শরীরের কোনও জায়গা তো আর বাকি নেই। নাক, কান, গলা, চোখ, মাথা, হাত, পা, হার্ট, লাংস, লিভার, কিডনি... সব তো তোর পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। তুই একেবারে মায়ের ধাত পেয়েছিস। বাবার লাইফ মা হেল করে দিয়েছিল রোগের বাতিকে। হ্যাঁ রে, অসুখ হওয়ার জন্য তোর শরীরে আর কোনও পার্টস বাকি আছে?

'আছে বড়দি।' দিতি সিরিয়াস মুখে বলল, 'প্যাংক্রিয়াস। এখনও ওখানে কিছু হয়নি।'

শুনে হাসব, না কাঁদব, বুঝে উঠতে পারলাম না। আধ ঘণ্টা আগে ডাঃ ব্রহ্ম আমায় বলছিলেন, মিঃ লাহিড়ি, আপনার সিস্টার ইন ল-র রোগটা দেহে নয়, মনে। অতৃপ্তি, অকারণ ঈর্ষা থেকে এই রোগ। যত শিগগির পারেন, ওকে একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। দেখবেন, উনি ভাল হয়ে যাবেন।' বাড়ি আসার সময় ভাবছিলাম, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দিতিকে নিয়ে যাব কী করে? কীসের ডাক্তার, শুনলেই তো দিতি বেঁকে বসবে। স্বাতীর দিকে চোখ যেতেই দেখি, কঠিন মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যার একটাই অর্থ, কী দরকার ছিল, সকালটা শুধু শুধু নষ্ট করার? মুখে অবশ্য ও বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকো না। ফ্রিজে কোনও সবজি নেই। এখুনি একবার বাজারে যাও। পেঁয়াজ আর পোস্ত আনতে কিন্তু ভুলো না।'

শুনে চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম আমার মনে হল, ভাগ্যিস স্বাতী ওর মায়ের বাতিকটা পায়নি।

উত্তর কলকাতায় প্রথম
কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত
লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান

মাল্টি স্লাইস

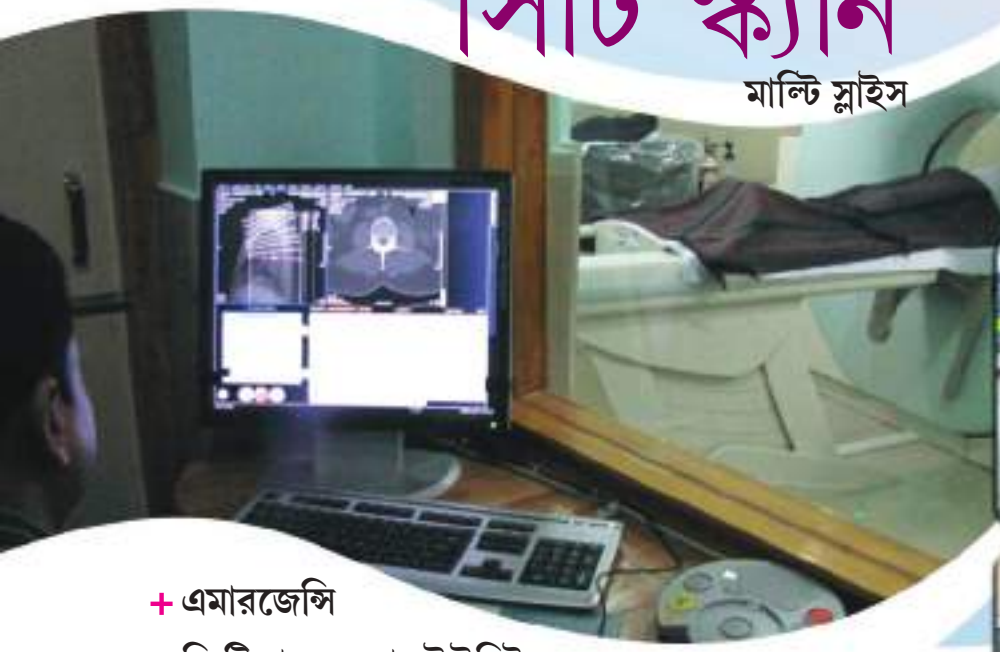

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

উৎসবের ভোজ

আগামী দু মাস হল উৎসবের সময়। শুধু বাঙালির দুর্গাপুজোই না লক্ষ্মীপুজো থেকে কালীপুজো, রয়েছে ভাইফোঁটাও। উৎসবের ভিন্ন দিনের জন্য দিয়েছেন মজাদার নানা স্বাদের রান্না। জানিয়েছেন **সুমিতা শুর**

ষষ্ঠীর জন্য

মিঠা দিলখোস

কী কী লাগবে

রসগোল্লা : ৮ টি ; আলু : ৪ টি ; হলুদ, নুন : স্বাদমতো ; আদাবাটা : ১ চামচ ; শুকনো লঙ্কা : ২ টি ; টকদই : ১$^{১}/_{২}$ কাপ ; গোটা গরম মশলা : ২ চামচ ; ঘি : ৫০ গ্রাম ; খোয়া ক্ষীর : ১$^{১}/_{২}$ কাপ ; ধনে গোটা : ২ চামচ ; কিশমিশ : ১০/১২টা।

কী করে করবেন

রসগোল্লাগুলো এক বাটি জলে ডুবিয়ে রসটা বার করে নিন।

এবার কড়াতে ঘি গরম করে আলু গোল করে কেটে খোসা ছাড়িয়ে ভেজে তুলুন। ধনে, গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তাতে নুন, হলুদ, টকদই একসঙ্গে ফেটিয়ে দিন। আদাবাটা দিয়ে কষে আলুগুলো দিয়ে জল দিন অল্প। ফুটে উঠলে ক্ষীর গুঁড়ো করে দিন। রস বার করা রসগোল্লাগুলো দিন। ভাল করে ফুটে উঠলে কিশমিশ দিয়ে নামান।

সপ্তমীর জন্য

তন্দুর বোয়াল

কী কী লাগবে

বোয়াল মাছের গাদা : ২ টি ; নারকোল বাটা : ১ কাপ ; সর্ষের তেল : ১½ কাপ ; নুন-হলুদ : স্বাদমতো ; সর্ষে বাটা : ২ চামচ ; হলুদগুঁড়ো : আন্দাজমতো ; পোস্তবাটা : ১ চামচ ; ফয়েল : আন্দাজমতো ; কাঁচালঙ্কাবাটা : ১ চামচ।

কী করে করবেন

বোয়াল মাছে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। আগেই কেটে পিস করে নেবেন। এর গায়ে নারকোল বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, পোস্তবাটা, সর্ষের তেল মাখিয়ে ফয়েলে মুড়ে চাটুতে অল্প তেল দিয়ে দুপিঠ সেঁকে নিলেই তৈরি তন্দুর বোয়াল।

বিজয়ার জন্য

পনির পায়েস

কী কী লাগবে

পনির ম্যাশ করা : ২০০ গ্রাম ; দুধ : ১ লিটার ; কনডেন্সড মিল্ক : ১ কাপ ; খোয়াক্ষীর : ১০০ গ্রাম ; চিনি : ১ কাপ ; এলাচগুঁড়ো : ৬ টি এলাচের।

কী করে করবেন

প্রথমে দুধে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে ফুটতে দিন। ঘন হলে কনডেন্সড মিল্ক ও চিনি মিশিয়ে টিমে আঁচে নাড়ুন। অন্যদিকে পনির খোয়াক্ষীর এক সঙ্গে মেখে বল বানান ছোট ছোট করে। ওই দুধের মিশ্রণে বলগুলো দিন। ৫ মিনিট পর নামিয়ে আরও একটু এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন পনির বলের পায়েস।

নবমীর জন্য

কাসুন্দি ইলিশ

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ : ২ পিস ; গুড় : ১ টেবিল চামচ ; গোটা শুকনোলঙ্কা : ২ টি ; সরষেবাটা : ১ বড় চামচ ; আমের কাসুন্দি : ২ টেবিল চামচ ; সরষেবাটা : ½ চা চামচ ; হলুদগুঁড়ো : প্রয়োজনমতো ; নুন : স্বাদমতো ; সরষের তেল : ৩ বড় চামচ।

কী করে করবেন

প্রথমে সরষেবাটা, হলুদগুঁড়ো, আমকাসুন্দি জলে গুলে মশলা তৈরি করুন। কড়াতে তেল দিন, গরম হলে মাছে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই শুকনোলঙ্কা, সরষে ফোড়ন দিন।

তৈরি করে রাখা মশলা দিয়ে কষে নুন দিন, সামান্য জল ও গুড় দিয়ে মাছগুলো দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন।

কাবুলি খিচুড়ি

লক্ষ্মীপুজোর জন্য

কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল : ৫০০ গ্রাম ; সোনামুগ ডাল : ২৫০ গ্রাম ; কাবুলিচানা (সেদ্ধ করা) : ২৫০ গ্রাম ; ঘি : ১৫০ গ্রাম ; গরম মশলা : অল্প গোটা ; গোলমরিচ : ১ চা চামচ ; আদাবাটা : ১ চামচ ; নুন : স্বাদমতো ; ধনে : ১ চা চামচ ; হলুদ : সামান্য।

কী করে করবেন

হাঁড়িতে ঘি গরম করে মুগডাল ভেজে তাতে গোটা গরম মশলা, গোলমরিচ, কালোজিরে দিন। চালটা ধুয়ে দিন। কাবুলি চানা সেদ্ধটাও দিন। জল দিয়ে ফুটতে দিন। সব সেদ্ধ হলে নুন, আদাবাটা ধনেবাটা, হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন কাবুলি খিচুড়ি।

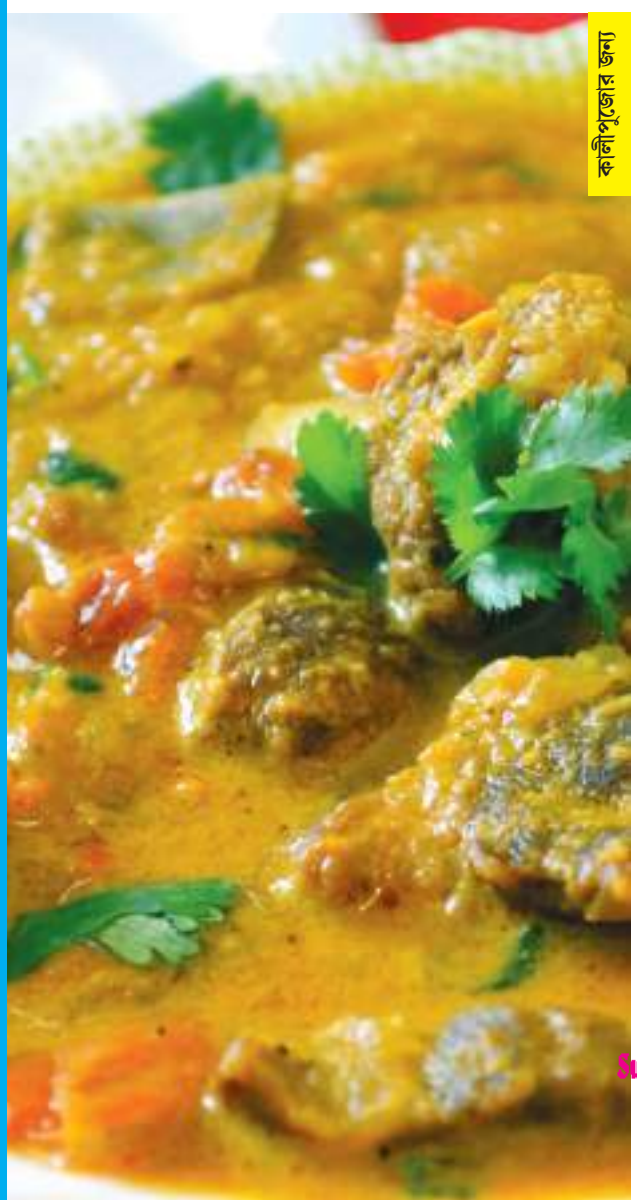

নিরামিষ মাংস

কালীপুজোর জন্য

কী কী লাগবে

মটন : ৫০০ গ্রাম ; টকদই : ১০০ গ্রাম ; ঘি : ৫০ গ্রাম ; জাফরান : $^{১}/_{২}$ চামচ ; দুধ : $^{১}/_{২}$ কাপ ; হলুদ : সামান্য ; চার মগজবাটা : ২ টেবিল চামচ ; পোস্তবাটা : ২ টেবিল চামচ ; শা-জিরে : $^{১}/_{২}$ চামচ ; শা-মরিচ $^{১}/_{২}$ চা চামচ ; গোটা গরম মশলা : সামান্য ; গোলমরিচগুঁড়ো : $^{১}/_{২}$ চা চামচ ; কাঁচালঙ্কা : ৪টি ; নুন -চিনি: স্বাদমতো।

কী করে করবেন

মটন দই, নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে ঘি গরম করে শা-জিরে গোটা গরম মশলা দিয়ে নাড়া চাড়া করুন। সুগন্ধ বেরোলে চারমগজ বাটা, পোস্ত বাটা দিয়ে কষে মটনটা দিন। এটা প্রেশারে দিন। ৫টা সিটি উঠলে নামিয়ে দেখুন মটন সেদ্ধ হয়েছে কি না। সেদ্ধ হলে তাতে দুধে ভেটানো চাফরান দিন। জলে শামরিচ ও গোল মরিচগুঁড়ো গুলে দিন। দমে রাখুন ৫ মিনিট। নামিয়ে পরিবেশন করুন পেঁয়াজ ছাড়া মটন।

চিংড়ি পাটশাক

ভাইফোঁটার জন্য

কী কী লাগবে

পাটশাক : ১ কেজি (গোটা পাতা) ; চিংড়ি : ৩০০ গ্রাম ; রসুনকুচি : ১ টেবিল চামচ ; গোটা শুকনো লঙ্কা : ২/৩টি ; মৌরি : $^{১}/_{২}$ চামচ ; আদাবাটা : ১ চামচ ; রসুনবাটা : ১ চা চামচ ; হলুদ : সামান্য ; কাসুন্দি : পরিমাণ মতো ; নুন : স্বাদমতো।

কী করে করবেন

আদাবাটা, রসুন বাটা, হলুদ ও সামান্য নুন দিয়ে চিংড়ি ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করুন। কড়াতে তেল গরম হলে গোটা শুকনো লঙ্কা, মৌরি ফোড়ন দিন। ফোড়নের সুগন্ধ বেরলে রসুনকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে পাটপাতা, চিংড়ি, নুন ও চিনি দিন। জল সামান্য শুকিয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে কাসুন্দি মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

শব্দ যখন যন্ত্রণা

পুজোর সময় দিনরাত উচ্চগ্রামে বেজে চলা মাইকের আওয়াজ, বাজি-পটকার বীভৎস শব্দ, এমনকী ঢাকের আওয়াজেও ক্ষতি হতে পারে কানের। ঠিকমতো চিকিৎসা করা না হলে এই সমস্যা স্থায়ী বধিরতাও ডেকে আনতে পারে। তাই মায়েদের সচেতন থাকতে হবে সব সময়। কীভাবে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিশিষ্ট ই এন টি সার্জেন ডাঃ **অজিত কুমার সাহা**।

প্রশ্ন : পুজোর সময় মাইক তো বাজবেই। এই শব্দ কি সত্যিই কানের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে?

উত্তর : অবশ্যই পারে। মাইকের আওয়াজ যদি ৬৫ ডেসিবেলের বেশি হয়, তাহলে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষ যে কারও কানের ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন : পুজো এলেই 'ডেসিবেল' শব্দটার ব্যবহার যেন বেড়ে যায়। ডেসিবেল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'ডেসিবেল' হল সাউন্ড প্রেশার লেভেল। অর্থাৎ শব্দ কতটা তীব্র তা বোঝানোর জন্য ডেসিবেল শব্দটা ব্যবহার করা হয়। দেখা গিয়েছে, ৬৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দ কান সহ্য করতে পারে। এর বেশি হলেই দেখা দেয় বিপত্তি। কানের সহ্য ক্ষমতার বাইরে যদি জোর করে বেশি ডেসিবেলের শব্দ শুনতে হয় তাহলে কানের ইন্টারনাল নার্ভের ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন : কী করে বোঝা যাবে শব্দজনিত কারণে কানের কোনও সমস্যা হচ্ছে?

উত্তর : মা ডাকছে কিন্তু শিশু শুনতে পাচ্ছে না, কিংবা শুনলেও মানে বুঝতে পারছে না, মাথা ঘোরা, একটুতেই রেগে যাওয়া ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কাজেই বার বার যদি এমন হয় যে শিশুকে অনেকবার ডাকার পর উত্তর দিচ্ছে কিংবা কোনও প্রশ্ন করলে ঠিকমতো মানে বুঝতে পারছে না, তাহলে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে দেরি করা উচিত নয়। হতে পারে এইসব সমস্যার জন্য দায়ী, শিশুর কানের অসুখ।

প্রশ্ন : এ সময় বাজির আওয়াজেও কি একই সমস্যা হয়?

উত্তর : বাজি, পটকার শব্দে সমস্যা আরও বেশি হয়। যে সমস্ত শব্দ বাজিগুলো পোড়ানো হয় তার কোনও কোনওটার আওয়াজ ১২০ ডেসিবেলের বেশি। এই শব্দ হঠাৎ করে যখন কানে প্রবেশ করে তখন কানের নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদিও আদালতের নির্দেশে শব্দবাজি পোড়ানো এখন নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও নিয়ম ভেঙে তা পোড়ানো হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই। বাজি পোড়ানোর জন্য যে 'নয়েজ পলিউশন' বা শব্দদূষণ হচ্ছে তা থেকে শুধু শিশু নয়, বয়স্কদেরও সমস্যা হতে পারে।

প্রশ্ন : বাজির আচমকা শব্দে আর কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

উত্তর : কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। এছাড়া কানের তৃতীয়ভাগ

ল্যাকারিন্থ বা অন্তঃকর্ণ যা আমাদের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে সেই অংশটাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

প্রশ্ন : এর থেকে কী কী লক্ষণ সাধারণত দেখা দেয়?

উত্তর : কানে ব্যথা, মাথা ঘোরা, কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ, ঠিকমতো শুনতে না পাওয়া ইত্যাদি নানা লক্ষণই দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন : এরকম হলে কি ইয়ারড্রপ দিলে কাজ হয়?

উত্তর : একেবারেই না। কানের কোনও সমস্যা হলে বাড়িতে নিজে থেকে কোনও ইয়ার ড্রপ, কিংবা গরম তেল ইত্যাদি দেওয়া চলবে না। চিকিৎসক যা চিকিৎসা বিধি দেবেন তা মেনে চলতে হবে। সাধারণত কানে ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ, প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক এবং নার্ভের কাজকর্ম ঠিক রাখার জন্য কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। ঠিকমতো ওষুধ ব্যবহার করলে আর কোনও অসুবিধে হয় না।

প্রশ্ন : ঢাকের আওয়াজ কাঁসর ঘণ্টার শব্দ নিশ্চয়ই ততটা ক্ষতিকর নয়।

উত্তর : আগেই বলেছি, ৬৫ ডেসিবেলের ওপর যে কোনও আওয়াজই ক্ষতিকর। কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের আওয়াজ সাধারণত ৬৫ ডেসিবেলের বেশি। আর সারাক্ষণ একভাবে এই শব্দ শুনতে হলে কানের ভেতরে প্রেশার জমে নার্ভ নষ্ট করে দিতে পারে। কাজেই তেমন শব্দ থেকে যদি ঘরে বসেও রেহাই না মেলে তাহলে কানে তুলো গুঁজে রেখে হলেও শব্দ যন্ত্রণা আটকানো উচিত।

প্রশ্ন : তীব্র আলোগুলো যে প্যান্ডেলের সামনে লাগানো হয় সেগুলোর আশপাশে নানারকম পোকা থাকে। সেগুলো কানে গেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : আমাদের কর্ণনালী যেহেতু প্যাঁচানো থাকে তাই কানে একবার পোকা ঢুকলে সহজে বেরনোর পথ পায় না। ফলে কানে অস্বস্তি হয়, ব্যথা হয়। এমন হলে ইএনটি চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করুন। নিজেরা কান খোঁচাখুচি করে পোকা বের করতে যাবেন না। কিংবা গরম তেল ঢালবেন না। এতে কানের পর্দার ক্ষতি হতে পারে। কানে ক্যানাল ইনফেকশন হলে পুঁজ হতে পারে।

প্রশ্ন : কানে পুঁজ কি পোকা ঢোকার জন্যই হয় নাকি আরও অন্য কারণ আছে?

উত্তর : কানে পোকামাকড় ঢোকা পুঁজ হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। তবে এছাড়াও কানে ফোঁড়া, ছত্রাকের সংক্রমণ, কানে খোল হওয়া, কিংবা নোংরা জল ঢোকা ইত্যাদি নানা কারণে পুঁজ দেখা দিতে পারে।

তবে এই সমস্যা যাতে বেড়ে না যায়, তার জন্য প্রথমেই সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। যত শীঘ্র চিকিৎসা শুরু হবে, ততই ভাল। অন্যথায় কানের পর্দা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাথা ঘোরা, মাথা ব্যাথা, জ্বর, বমি ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমদিকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব।

জেনে রাখুন

- কানে কখনওই গরম তেল দেবেন না।
- কানে কিছু ঢুকেছে মনে হলেও নিজে খোঁচাখুচি করবেন না।
- নিজে থেকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ইয়ার ড্রপ শিশুর কানে দেবেন না।
- একটানা বেশিক্ষণ উচ্চ ডেসিবেলের শব্দের সংস্পর্শে শিশু যাতে না থাকে খেয়াল রাখুন।
- কানে কোনও সমস্যা হচ্ছে মনে করলে ইএনটি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

চাওয়া

জয়নাল আবেদিন

চাওয়া ফুরিয়ে গেলে
হাঁটার রাস্তাও মরে যায়,
তখন অভিমান নিয়ে বসে থাকি।

ইঁদুর দেখেও চমকে চমকে উঠি
কথার পর কথা সাজাতে পারি না
ক্রোধের কাছে নিজেকে সঁপে দিই।

জল দেখেও ভয় পেয়ে যাই।
পাশে কাউকে পাই না
শুধু বারান্দায় পায়চারি করি।

চাওয়া ফুরিয়ে গেলে
বাঁচার ইচ্ছেও হারিয়ে যায়
তখন মাকে ভীষণ মনে পড়ে।

জেলখানা

দেবাশিস চক্রবর্তী

আমি এখন জেলখানায়
স্বপ্ন-বাস্তব
প্রেম-ভালবাসা
নিজ ধারণা-কল্পনা
আটক এখন এই
কয়েদখানায়।

এখন রাত অনেকটা
জেলখানা থেকে বেরিয়ে
পড়ি
সব শূন্য মহা শূন্যে
আমি চলতে থাকি
এ কী মুক্তি কী মুক্তি
কী আনন্দ!
আমি এখন মহাশূন্যে
—তারাদের বাড়ি—
গতি বেড়ে যায় আমি ছুটি
চাঁদ তারাদের বাড়ি.
হঠাৎ অচেনা আর্তনাদ
কিছু বোঝার আগেই
তারাদের বাড়ির দরজা বন্ধ,
আমি চিৎকার করি
বিষ অন্ধকার
ধেয়ে আসে
আমি এখন জেলখানায়
প্রেমহীন দমবন্ধ—
আমি এখন জেলখানায়
কয়েদি নাম্বার একশো।

কিরে খোকা এলি?

লালবাহাদুর সরদার

দরজায় ঠক ঠক।
কিরে খোকা এলি?
সেই কোন সকালে বেরিয়েছিলি!
দিন গেল রাত যায়,
ভোর হয় হয়।
বাবা-মা বসে ঠায়,
রাত জেগে রয়।
গতরাতে গণতন্ত্র খুন হয়েছে;
খবরের কাগজে খোকার দেহ।
অন্যায়কে প্রতিবাদ, তাই খন্ডিত দেহ।
অন্তরে ঠক ঠক
কিরে খোকা এলি?

দ্বিতীয় সুনামি

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানের সুনামির ঠিক পরের দিনই দিঘিদের বাড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছিল। ইঁট, কাঠ, পাথরের জঞ্জালের মধ্যে থেকে দিঘি খুঁজে পেয়েছিল অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া কাপড়ের পুতুলটা। যেটা তারা জয়ী পিসির বিয়ে হওয়ার পরে, বড় ঘরের ওপরের তাকে রাখা একান্ত প্রিয় পুতুলের বাক্স থেকে সরিয়েছিল।

সেই নানারঙের খাঁজকাটা ক্রিস্টাল টুকরোটাও বেরোল ধূলোর স্তূপের নীচ থেকে। এখনও দিঘির মনে আছে কীভাবে সকালদি, ফাগ আর সে বাবুর বাড়ির ঝাড়লণ্ঠন থেকে ভরদুপুরে, নিঃশব্দে ওটা খুলে নিয়েছিল। তারা তিনজন, ছোটবেলার খেলার মাঠে তৈরি করা মানুষ পিরামিডের ভঙ্গিতে একে অপরের গা বেয়ে উঠে, ওই ঝুলে থাকা অপূর্ব জিনিসটায় ভয়ে ভয়ে হাত ঠেকিয়েছিল। তারপর ছিঁড়ে নেওয়ার লোভ আর সংবরণ করা যায়নি। ক্রিস্টালের সাত রঙের খেলাই তাদের টেনেছিল। আট থেকে বছর বারো তেরো বয়স অবধি এইসব কাজগুলো অনায়াসে এতটুকু বিবেকের দংশন ছাড়াই তারা করে ফেলত। কেন না স্কুলের বন্ধুদের আকর্ষণীয় জিনিসপত্র দেখার সময়, তাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা দিনদিন বড়ই অসহ্য হয়ে উঠছিল। যেহেতু তাদের ভাঁড়ার বরাবর শূণ্য, আর রাতারাতি ভরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, ওইসব ঘটনাকে চুরি ভেবে অহেতুক লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ তারা দেখত না। তাই অক্লেশে ওইসব ঘটনাগুলো তারা ঘটিয়ে ফেলত।

অদ্ভুতভাবে দিঘিদের ছোটবেলায় চারপাশের এসব অনুচিত ব্যাধির সঙ্গে অপরিচ্ছন্নতার কিছু অবধারিত অনুসর্গ জুটত। যেমন কোনও এক সকালে তারা আবিষ্কার করেছিল ঝর্ণার 'খোস' হয়েছে। 'খোস' মানে হাতে পায়ে ছোট ছোট পুঁজ ভর্তি ঘা। রোগটা তখন ঘরে ঘরেই প্রচলিত ছিল। খোস্ রোগগ্রস্ত ঝর্ণাকে বা মাথায় উকুন হওয়া শেফালিকে সেসময় খেলায় নেওয়া হত না। তারা কুষ্ঠরোগীর মত বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকলে অন্যদের একধরনের

স্বাতন্ত্র্যের তৃপ্তিবোধ হত। এছাড়া খেলতে গেলেই ঝাগড়া ছিল অবধারিত ঘটনা। আমোদের মতো, যেকোনও ঝগড়াই বুঁদ করে রাখত তাদের। আর তারাও পারস্পরিক সম্পর্কের ধুয়ো তুলে ঝগড়ায় মগ্ন হত।

ওই রকম এক সকালে যখন হাসিদির বিয়ের শাঁখ বাজছে, ফাগ সকালদিকে মোক্ষম প্রশ্ন করেছিল, 'লাভ ম্যারেজ' কী? সকালদি দিঘিদের থেকে দু-তিন ক্লাস উঁচুতে পড়ত। পৃথিবীর যাবতীয় বিস্ময়জনক গোপনীয় ব্যাপারস্যাপার সম্পর্কে তার যে অগাধ জ্ঞান, সে বিষয়ে দিঘিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। সেদিন কে জানে কেন সকালদি ফাগকে মারমুখো হয়ে তেড়ে গেল। জেনে কী করবি শুনি? খালি পাকা পাকা কথা!

যদিও ওই তথ্যটা খুব বেশিদিন অজ্ঞাত থাকেনি। তবে সেদিন 'লাভম্যারেজ' যে প্রাপ্তবয়স্কদের এলাকাভুক্ত বিশেষ নিষিদ্ধ ঘটনা সেটুকু বোঝা ছাড়া আর কিছুর এমনকী আন্দাজও পাওয়া যায়নি। 'লাভ' মানে ভালবাসা, 'ম্যারেজ' মানে বিয়ে। তবু সবমিলিয়ে বিষয়টা অত রহস্যজনক কেন সে নিয়ে সেই মুহূর্তে তারা খুবই চিন্তিত হয়েছিল। বড়দের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেছিল বিষয়টা খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু লাভম্যারেজের লিস্টে প্রীতির জাঁদরেল পিসিমণি আর গম্ভীর বড় পিসেমশায়ের নাম ঢুকে পড়ায় তারা খুবই ঘাবড়েছিল। সেসময় যে কেউ তাদের ভয় দেখাতে পারত। ফাগ একসঙ্গে পড়লেও বয়সে বড় ছিল। 'থ্রি' ক্লাসে সে একবার ফেল করে। দিঘিকে ভয় দেখিয়ে ফাগ বলেছিল 'ক্লাস থ্রি' ভীষণ শক্ত। দেখিস তুইও একবারে পাশ করতে পারবি না। অবলীলাক্রমে ফোরে উঠে দিঘি একদিন সেই ভয়টা কাটিয়ে ফেলে। সেদিন ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভাঙাবাড়ির এককোণে, কয়লাভাঙা হাতুড়িটাও নজরে এলো দিঘির। অনেকদিন আগে কয়লাভেঙে রান্না করতে হত। হাতুড়িটা সেই প্রস্তর যুগের সাক্ষী। পাড়ায় প্রথম গ্যাস ব্যবহার করে বিজলিবৌদি সবার ঈর্ষার পাত্র হয়। বৌদির টিভি, ফ্রিজ, গ্যাস, খাট, ড্রেসিংটেবিল, সোফাসেট সবই ছিল। কিন্তু কোনও অহঙ্কার ছিল না। দিঘিদের চোখে বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও, বৌদি সবার সঙ্গে মিশত। সবাইকে বাড়িতে ডাকত। যদিও নিন্দুকেরা বলত বৌদির স্বভাব ভাল না। সমরদা না থাকাকালীন ক্লাবের ছেলেদের বাড়িতে ডাকে। আড্ডা মারে। এইসব নানা কারণে ভালমন্দের ধারণাটা বারবার গুলিয়ে যেত দিঘিদের। তাদের ছোটবেলাটা ওইসব গোলমেলে আবছা ধারণা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে হঠাৎ করেই একদিন শেষ হয়ে যায়। রেখে যাওয়া কিছু কিছু নিদর্শন লুকিয়ে ছিল ওই ভাঙাবাড়ির ধূলোময়লার নীচে। যা সত্যিকারের সুনামির মতো দিঘির মনটাকে উথাল-পাথাল করে দিচ্ছিল।

এই সুনামির আগের সুনামিতে দিঘির বয়স আরও কম ছিল।

টিভিতে সমুদ্রের ঢেউ-এর বিশাল আস্ফালন লক্ষ্য করতে করতে ওর ছেলেবেলায় পাড়ার গঙ্গানদীতে ধেয়ে আসা বানের কথা মনে পড়েছিল। ওই নদীর জলে স্নান রবিবারের বিশেষ বিনোদন ছিল দিঘিদের। যেদিন বান আসার কথা থাকত, কেউ নদীতে স্নান করত না। একমাত্র গোকুল সেনের বড় ছেলে হাবু নামত জলে। ঢেউ-এর বুকে তার ওঠানামা দেখতে দেখতে শিউরে উঠত দিঘিরা। সুনামির সময় সেই একই আতঙ্ক! যদিও তার মাত্রা অনেক বেশি।

দিঘিদের ভেঙে পড়া বাড়ির ধূসর ধূলোবালির মধ্যে, দিঘি আসলে খুঁজছিল বনুকে। মানে বনুর স্মৃতিময় কিছু ওখানে রয়ে গেছে কিনা। উপহারের পুরনো ঝুরঝুরে কিছু বই। ভাঙা ক্লিপ, প্যাঁচ হারানো দুল, ফেলে না দেওয়া ছেঁড়া স্কুলের ব্যাগ ছাড়া বনুর আর কোনও সম্পত্তিই টিকে ছিল না। বাকি সব কবেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। গুঁড়ো হওয়া বাড়ির মধ্যে তাদের কোনও চিহ্ন নেই। তবু দিঘি হাল ছাড়েনি।

বনু দিঘির পাঁচ বছরের বড় দিদি। দিঘি ভেবে দেখেছে ঠিকঠাক সাজালে ওর জীবনে তিনটে সুনামি ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুই সুনামির মাঝে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় সুনামির সাক্ষী একমাত্র দিঘি। যার ভাগ এ পৃথিবীর আর কেউই পেতে পারে না।

দ্বিতীয় সুনামির ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকায় দীপকদার নামটা অবশ্য ঢোকানো যেতে পারে। বস্তুত, ওই সুনামিতে দীপকদা দুমড়ে মুচড়ে খান খান হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র তীরের মানুষদের মতো দীপকদার সেই হাড় জোড়া লাগাও খুব শক্ত বৈকি। কেন না বনু মানে দিঘির বড়দিই ছিল দীপকদার ভালভাবে বেঁচে থাকবার শেষ আশাভরসা।

ঘটনাটা এভাবে সাজানো যেতে পারে, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দিঘি বুঝেছিল তার জীবনে দ্বিতীয় সুনামি ঘটেছে। কোনওকিছুই আর আগের অবস্থায় ফিরবে না। কেন না বনু নেই।

নিজেকে শেষ করার জন্য চিরকালীন পুরনো পদ্ধতিটাই বেছে নিয়েছে বনু। একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে বরাবরের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দিঘি। কেন চলে গেল বনু? কেন?

বনুর একটা আলাদা ঘর ছিল। যদিও সেঘরে বনুর নিজস্ব খাট ছাড়া ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে ভর্তি ঠাকুর, জামাকাপড়ের আলনা, পুরনো বড় তোরঙ্গগুলোও থাকত বৈকি। তবে বনুর গোছানি স্বভাবে সবকিছুর মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্যের ঢাকনা ছিল। বনুর ছেড়ে রাখা জামাকাপড়ে, চিরুনীতে আটকে থাকা চুলে, অথবা হাওয়ায় উড়তে থাকা গামছাতেও মাখামাখি হয়ে থাকত তার স্বভাবের পরিপাট্য। শান্ত শ্যামলা ছিপছিপে দীঘল শরীরটার মতো, লম্বা আঙুলগুলোর মতো, ভাসা চোখ আর চাপা নাকের মতো ওই ঘরের হাওয়ায় সে মধুরতার চিরকালীন মাখামাখি ছিল। যেখানে দিঘি বারবার আশ্রয় নিয়েছে। ঘ্রাণ নিয়েছে চিরকালীন শান্তির। বনু অর্থাৎ বনানী, দিঘি অর্থাৎ রুনু আর অনু অর্থাৎ অরণ্য, যে কিনা ওদের একমাত্র ভাই। বাড়ির দ্বিতীয় পুরুষমানুষ। ওদের সবার নাম রেখেছিলেন সজলকাকা। বাবার এক কবি বন্ধু। শুধুমাত্র নামগুলো ছাড়া ওদের বাড়িতে সুরুচির আর তেমন কিছু প্রকাশ ছিল না। কিংবা ছিল। সে হল বনানী। বাবা-মার প্রথম সন্তান। যার মধ্যে অদ্ভুতভাবে কিছু লাবণ্য এসে মিশেছিল। দেখে দেখে দিঘি মুগ্ধ হত। কখনও বা অনুকরণের চেষ্টা করত।

বাড়িতে চলত সেই চিরকেলে ধরনধারণ। বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বনুর তেমন কোনও গুরুত্ব ছিল না। স্কুল থেকে ফিরলেই মা ডাক দিতেন বনুকে। ও বনু আয়, দুটো লুচি বেলে দিবি। অনু খেয়ে যাবে। ওর তাড়া আছে কিন্তু।

দিঘি চেঁচাত মা লুচি করছ? আমাদের কটা করে দেবে? তোমাদের দেব বলেছি নাকি? মা খ্যাঁকাত। সাদা তেল একদম বাড়ন্ত। অনু একেবারে রুটি খেতে চায় না। তাই শুধু ওর জন্যেই কয়েকটা... । মার বাক্য অসমাপ্ত থাকলেও দিঘি জানত বাড়ির কর্তার জন্যও কয়েকখানা লুচি অবশ্যই করা হবে। তাই গোঁজ হয়ে ও মুখ ভারি করলে, বনু লুচি বেলতে বেলতেই বলত, তোর দুটো হয়ে যাবে। লেচি ছোট করে নেব।

কখনও বা বাবা হাঁক পাড়তেন, ও বনু, এ মাসে টাকা কম দিলি কেন? বনু অবাক হত, তাই? কম বুঝি?

সেকি? ব্যাঙ্কের পাসবই দেখিসনি?

ও তো তোমার কাছেই থাকে।

স্কুলের মাইনের খাতায় সই করার সময়ও তো জানা যায়।

হবে হয়তো। আমি খেয়াল করিনি।

এসব খেয়াল করতে হবে। টাকার জন্য তো চাকরি, নাকি?

দিঘি ভাবত বাবা এমন কেন বলে? শুধু টাকা? স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাহচর্য, ক্লাসে ভালবেসে পড়ানো, নানারকম ক্রিয়াকর্ম, অনুষ্ঠান, একেবারেই কিছু না? নাকি বাবাই খেয়াল করে না সেসব। এমনকি দিদিমণি হিসেবে বনুর সামাজিক মর্যাদাকেও একেবারেই পাত্তা দেয় না যে কেন। আর বনু শুধু সয়ে যায়। কাগজে কত সন্ত্রাসের গল্প, অথচ বাড়ির চার দেওয়ালের মাঝে অহরহ ঘটে চলেছে নিঃশব্দ সন্ত্রাস! তার খবর কেউ রাখে না। দিঘি মাঝে মধ্যেই ভাবত এসব। আসলে বনু যতদিন ছিল একটা বড়োসড়ো আকাশ ছিল দিঘির। আকাশের মেঘ যেন মুখ দেখত দিঘির জলে। নীল স্নিগ্ধ ছায়া মাঝে-সাঝেই ঢেকে দিত ওর অশান্ত ক্ষুব্ধ মনকে।

দিঘি ফুঁসে উঠত প্রায়প্রায়ই। তা কেন হবে? বছর বছর তোমার মাইনে বাড়ছে, সব বাবার কাছেই যাচ্ছে তো। অথচ মাসের শেষে সেই এক চারশো টাকা ঠেকাবেন তোমাকে। ওতে কী হয়? যাতায়াত, হাতখরচ... ।

হয়ে যাবে তো, নরম করে বলত বনু।

মোটেই হয় না। হাঁফাতে হাঁফাতে হেঁটে স্টেশনে যাও তুমি। আবার সন্ধেবেলা ক্লান্ত শরীরে হেঁটে হেঁটে ফেরো। একে কি হয়ে যাওয়া বলে? কষ্ট চেপে চেপেই তুমি গেলে। আর কত ভাল মেয়ে হবে?

কষ্টের কী হল? আমার অসুবিধে হয় না। বেশ লাগে।

ছাই লাগে! বিরক্তিতে ঠোঁট ওল্টাতো দিঘি।

কী করব বল, লেডিস সাইকেলটা চুরি হয়ে গেল যে।

গেল তো গেল। আর কেনা যায় না? একটা সিনেমা দেখতে গেলেও বাবার কাছে হাত পাত তুমি। অথচ অনুকে ত্রিশ হাজারের বাইক কিনে দিল বাবা।

আরে ছেলেমানুষ। একটা বায়না করেছে... ।

এরপরে চুপ করে যেত দিঘি। মনে মনেই বলত তোমার কেন বায়না নেই বনু? এত টাকা রোজগার কর, হাতে সেই চারশো। একটা ভাল রেডিও কিনবে বললে, মা পুজোর কেনাকাটার অজুহাত দিল। কেন? তোমারই তো টাকা। একটু শখ হয় যদি... । এরা তোমাকে ঠকাচ্ছে।

বনু বলত তুই আর এ নিয়ে ভাবিস না। বাবা মা যা ভাল বোঝেন তাই করেন। তুই এখন ঘুমো দিকি।

ও যে কী করে দিঘির মনের কথা পড়ে নিত! পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে হত এসব কথা। সারাদিনে ওই একটাই তো সময়। নরম লাল নীল ফুল তোলা সাদা কভারের দুটি বালিশ। তুঁতে রঙ-এর চাদরে ছোট ছোট সাদা ফুলের নকশার সাধারণ

বিলাসিতা। কাছাকাছি দুজন। মশারি টাঙানোর আগে অবধি নিঃসাড় পড়ে থাকতে দিঘি। চারপাশ গুঁজে ডাকত বনু। আর মটকা মেরে থাকতে হবে না। মশারি টাঙানো হয়ে গিয়েছে।

তুই জানতিস, আমি ঘুমোইনি?

বনুকে ইচ্ছেমত তুই, তুমি বলত দিঘি।

জানব না কেন? বনু রাগত না একফোঁটা।

তবে ডাকলি না কেন?

উত্তরে মুচকি হাসত বনু।

তুই খুব ভাল রে। বনুর নরম হাত ধরে বলত দিঘি।

তুইও। তখন বনুর হাত ঘুরত দিঘির মাথায়। আর দিঘি ঘুমোত নিশ্চিন্তে। বনের ছায়া মেখে। সেই ছায়া সরে গেল। ছোট থেকেই বনুকে দিদি বলেনি দিঘি। তাই নিয়ে কত কথা। ঘরে বাইরে কথা বলতে কে ছাড়ে? আসলে বনুকে মনে মনে মা বলত দিঘি। মায়ের মতই তো।

কিরে মুখ গোমড়া কেন?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু। কে বকল? মা?

আবার কে?

টাকা চেয়েছিলি বোধহয়?

কী করে জানলে?

জানা যায়, কত?

কেন?

বল না।

না। তোমার কাছে নেব না। তোমারই কুলোয় না, আবার আমায়...।

ও তোকে ভাবতে হবে না। বলে ফ্যাল। কত?

দুশো। অনার্সের ওই বইটা না কিনলেই চলবে না। লাইব্রেরিতে মোটে একটা বই। মা বলছে...।

ঠিক আছে হয়ে যাবে।

তোমার থেকে দেবে তো?

আবার? বললাম না। বনু চোখ পাকাত নরম করে।

এখন মনে হয় বনুর চলে যাওয়াটা দিঘি ছাড়া আর কারও পক্ষেই তেমন খারাপ হয়নি। একসঙ্গে স্কুলের অতগুলো টাকা। পরে পেনশনের ভরসা, বাবা বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়িতে হাত দিলেন। অনু বড় বাজারে গিফটের দোকান খুলল। দিঘির ছেলে দেখাই ছিল। শুধু দিন ঠিক হওয়ার অপেক্ষা। মায়ের চোখের জলও নির্ঘাৎ শুকোবে একদিন।

শুধু আস্ত একটা বন, নিঃসাড়ে, সব ডালপালা নিয়ে উধাও।

দ্বিতীয় সুনামির কারণ ছিল 'লাভ ম্যারেজ'। মানে দিঘি যা বুঝেছে, লাভ হয়েছিল। ম্যারেজটা আর হল না। ঘটনাটা এভাবে সাজানো হয়েছিল যে লাভ ম্যারেজে আমরা কোনও মতেই রাজি নই। হাসি পেয়েছিল দিঘির। এই একবিংশ শতাব্দীতে এত বোকা অজুহাতও যে কেউ দিতে পারে।

আসলে মেঘে মেঘে বেলা যে ঘনিয়ে উঠেছে তা বজ্রপাতের আগে বোঝা যাবে কী করে? যেখানে শুধু ম্যারেজ হলেও ভারি মুস্কিল না? আর ভাবি জামাইটিও কম সেয়ানা নয়। নিজের চালচুলো নেই, যোগানের আশা সবক্ষেত্রেই কম, শুধুই চাহিদা, মাগো!

এদিকে দ্বিতীয় পুরুষ অরণ্য যে এখনও অবলা হয়ে আছেন। তার বলভরসা কই? তবে না উদারতা খাটে। তারপরেও শেষ নয়। খোদ দিঘির কপালে পা। মানে ঘুরে ফিরে দেখতে এ বিয়ে হলে আরেকটা বিয়েতে অবধারিত ধামাচাপার সম্ভাবনা। অতএব বাধার সবশেষ কারণ ছোটমেয়ের বিয়ে। যা বনুকে না জানিয়ে প্রায় চুপিচুপিই স্থির হয়েছে। কোনও মেয়েরই বিয়ে না দিলে লোকে কী বলবে? তাছাড়া দিঘি তো সংসারের ভার, বোঝা। বিয়ে হলে একটা খাইমুখ কমে।

ওরা হয়ত বিষয়টা এভাবে সাজাননি। তবু দিঘি জানত এভাবেই সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের নিয়ম কাজ করে থাকে। কিন্তু দিঘি এবার চুপচাপ ছিল। মনে মনেও প্রতিবাদ করেনি।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঠাণ্ডা পুতুলটা একবার জেগে উঠেছিল। মানে দ্বিতীয় সুনামির ঠিক আগে, খোলা চুলে, এলোমেলো কাপড়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল একবারই। বরফ ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, তাহলে এই তোমাদের শেষ কথা? মা তুমিও সত্যিই চাইছ না আমি দীপককে বিয়ে করি? বলো, দেরি কোরো না। আমার আর সময় নেই।

মা বলেছিলেন, ঠিক আছে। দেখছি, আগে দিঘির বিয়ে দেব, ওকে তো পছন্দ করে গেছে।

সেবার দিঘির দিকে বনু তাকিয়েছিল স্থির। বলেনি এতকিছু হল আমি জানি না কেন? দিঘি তুই বলিসনি তো? শুধু বলেছিল, ও আচ্ছা। ঠিক আছে। যেমন ও বলেছে চিরকাল।

দিঘি সেদিন তাকায়নি বনুর দিকে। নিজের সাদা বালিশ নিয়ে

নিজেকে শেষ করার জন্য চিরকালীন পুরনো পদ্ধতিটাই বেছে নিয়েছে বনু। একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে বরাবরের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দিঘি। কেন চলে গেল বনু?

সেঁধিয়েছিল মায়ের ঘরে। ও কি চিরকাল বনুর ছায়ায় থাকবে? শুধু শুধু কেনই বা বাবা মার অবাধ্য হবে?

আসলে নিজের সুবিধে না বোঝার মতো বোকা তো দিঘি ছিল না। সে তো কোনওদিনই বনু নয়। শেষের দিকে দিঘিও একটু একটু বনু হয়েছিল। মুখে কুলুপ আঁটা, শান্ত। চুপচাপ। ভূপেন ডাক্তারের বাঁ পকেটের সার্টিফিকেটে যখন বনুর হার্টফেলটা পাশ হয়ে যায়, ও ভেবেছিল, বাবা মাকে তো বাঁচাতে হবে। পোস্টমর্টেম, পুলিশ, এসবের ম্যাও সামলাবে কে?

বাড়ির বড় মেয়ে। শ্রাদ্ধশান্তি হল শেষ অবধি। বনুর স্কুলের বন্ধুরা একটা নতুন রেডিও রেখে গিয়েছিল তাদের বনানীর ছবির সামনে। গোড়ের মালা, কপালে চন্দন, বেশ লাগছিল বনুকে। রেডিওটা এখনও বাজে। আর দিঘি অবাক হয়ে ভাবে অপূর্ণ ইচ্ছেটা ওরাও জানত তাহলে।

কিন্তু এই দ্বিতীয় সুনামির খবর আর কেউ রাখে না। হঠাৎ উথলে ওঠা ঢেউ কি দিঘিকেই ভাসায়নি। বাবা মা তো বরাবরই একরকম। অনু তো আহা, বাড়ির দ্বিতীয় পুরুষ। তবে কি এ কাহিনির শুরু সাদা বালিশে, শেষও সেখানেই।

দিঘি বুঝেছিল গল্প এভাবেই শেষ হয়। কেন না মুড়ে যাওয়াই নটে গাছদের নিয়তি। ধুলোর পাঁজায় পুতুল থাকে, চুরি করা পাথর ঝকঝক করে। হাতুড়িও প্রস্তর যুগের সাক্ষ্য দেয়। শুধু কোনও ছায়া থাকে না। গনগনে রোদে দিঘির তালু পোড়ে। কেউ হাত বাড়ায় না। একটা একটা করে দিন যায়। ভেতরে ভেতরে বালি সরে। জলের নীচের স্তরে ওলটপালট হয়। আর এভাবেই ফুঁসে ওঠে হিংস্র সুনামি। শুরু হয় অন্য গল্প।

নায়িকা সংবাদ

পুজো, পোশাক, প্রসাদ, প্রসাধন, এই সবকটাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এবার পুজোয় কেমন সাজবেন, কোথায় কী সবচেয়ে ফ্যাশনেবল, জানিয়েছেন কয়েকজন নায়িকা। দেখে নিন, আপনাদের মতের মিল হয় কি না

পায়েল সরকার

● লং স্কার্ট, লং কুর্তা, ওয়েজ হিল

এ বছর পুজোয় লং স্কার্ট ইন। একটু ঘেরে দেওয়া গোড়ালি অবধি লম্বা স্কার্ট, সঙ্গে কুর্তি, পরলে ভাল লাগবে। তবে আমি পছন্দ করি স্প্যাগেটি। স্কার্টটা ঘের দেওয়া, তাই উপরের জামাটা একটু আঁটো সাঁটো হলে ভাল লাগবে। সঙ্গে বাইরে বেরনোর সময়, একটি শ্রাগ বা ছোট জ্যাকেট কিংবা একটা মাসাবা স্কার্ফ নিলে মন্দ হবে না, বিশেষত বাইরে ভিড়ে বা রাস্তায় বা পুজো মন্ডপে গেলে। জুতো হিলতোলা ছাড়া চলে না আমার। ওয়েজ হিল বেশি ইন। শুধু মাত্র স্টাইলিশই নয়, পরেও আরাম ওয়েজ হিল। আর এখন নানা ধরনের ওয়েজ হিল পাওয়া যাচ্ছে, কখনও ফুল কাভার দেওয়া, কখনও স্ট্র্যাপি। এছাড়া এ বছর স্ট্রেট এ-লাইন লম্বা কুর্তা ফ্যাশনেবল। খুব চুড়ি দেওয়া চুড়িদার, আর সঙ্গে লম্বা কুর্তা দেখতে দারুন লাগে। আর শাড়ি পরলে সঙ্গে চাই ব্লাউজে রকমফের!

গার্গী রায়চৌধুরি

● পুজোয় নারী মানেই শাড়ি আমার কাছে আজও পুজো মানেই শাড়ি। শাড়ি পরে মেয়েদের যে সৌন্দর্য, যে আকর্ষণ, যে লাবণ্য প্রকাশ পায়, তা আর অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। অবশ্য আমি রোগা হয়ে, নিজেকে টোন করার পর নানারকম অন্য ধাঁচের পোশাকও পরতে শুরু করেছি। সম্প্রতি 'বিটনুন' বলে একটি ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে নানারকম পোশাক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। এমনকি সেই ছোট কালো ড্রেসও পরেছি। যা হয়তো আমার পক্ষে নতুন। কিন্তু ভাল লাগছে নানারকম পোশাক পরতে। তাও বলব শাড়ির বিকল্প আমার কাছে নেই। এবার আমি শিফন, ক্রেপ, এই ধরনের শাড়ি সঙ্গে অন্য ধাঁচের ব্লাউজের উপর বেশি নজর দিয়েছি। স্লিভলেস ব্লাউজও পরছি। রোগা হয়েছি বলেই শিফন পরছি। অনেকের ধারণা মোটাদের শিফন পরলে রোগা লাগে, আমার মনে হয়, ব্যাপারটা উল্টো, রোগা হলে তবেই শিফন ভাল ড্রেপ করে। খাদির মলমল সুতির শাড়ি, যা শরীর জাপটে রাখে, তাও খুব পছন্দ আমার। সঙ্গে রুপোর গয়না। তবে সোনার গয়না অষ্টমীতে অবশ্যই পরব। আর জুতোর ক্ষেত্রে হিলতোলা অবশ্যই। কারণ হিল পরলে শাড়ির 'ফল' এবং নিজের হাঁটাও বদলে যায়, আরও গ্রেসফুল হয়। প্রসাধনের ক্ষেত্রে, টিপ, লিপস্টিক ও কাজলই যথেষ্ট। আর ওয়েস্টার্ন পোশাক পরলে, খুব হালকা স্টাড দুল কানে!

জুন মালিয়া

● গরদ পরব অষ্টমীতে সারা বছর ধরেই পোশাক আশাক কিনি, তাই পুজোর জন্য আলাদা করে আর তেমন কেনাকাটা হয় না। কিন্তু অষ্টমীর জন্য একটু নতুন কিছু আমার থাকেই। গতবছরই 'বাইলুম' থেকে অর্ডার করেছিলাম, একটি গরদ শাড়ি। ওদের গরদটা আলাদা। সেটাই পরব এবার পুজোর অষ্টমীতে, সঙ্গে সোনার গয়না। কানপাশা ও বালা যথেষ্ট। মেয়ের জন্যও এ বছর শাড়ি কিনছি। ও বড় হয়েছে, নানারকম পোশাক অবশ্যই পরছে ও পরবে। কিন্তু শাড়ির আকর্ষণ, শাড়ির সৌন্দর্য অনন্য। ছেলের জন্য জ্যাকেট কিনেছি ফ্যাব ইন্ডিয়া থেকে। দেশজ পোশাক আমার খুব পছন্দ।

ইন্টারভিউ

অনুপ ঘোষাল

কথা ও কাহিনি -২

বিতানের সবচেয়ে খারাপ লাগে এই অপেক্ষা করাটা। ভাল বা মন্দ যা-কিছু একটা হয়ে যাক না কেন! এই ভ্যাবলার মতো বসে থেকে সময়কে পিছু ঠেলতে ঠেলতে এমন বিরক্তি লাগে, ধুত্তোর নিকুচি করেছে বলে কেটে পড়ে কখনও।

কিন্তু এখন সে উপায় নেই। প্রথমত এটা গার্লফ্রেন্ডের আসার পথে জুল জুল করে চেয়ে থাকা নয়, ডাক্তারের চেম্বারে নাম লিখিয়ে রুগির ভিড়ে সেঁটে থাকাও নয়। এটা একটা চাকরির ইন্টারভিউ। কাজটা পেলে ওর সুবিধে হয়। দ্বিতীয় কারণ, এসেই প্রার্থী হিসেবে ওদের একটা হাজিরা খাতায় নাম আর মোবাইল নম্বর লিখে ফেলেছে। নির্দিষ্ট সময় পেরোনো মাত্র এই লবির সামনে ঢোকার দরজাটা বন্ধ করে অফিসের একজন কর্মী উপস্থিত সকলের সই নিয়ে ভিতরে চলে গেছে। এখন ডাকা হচ্ছে এক এক করে।

বিতান সইটা করেছিল তিনজনের পরে। কজনকে নেবে কে জানে! মোট হাজির ছিল আটজন, কিন্তু তার আগেই পাঁচজনের ডাক পড়ে গেল। আরও চারজন বসে আছে। হিসেবটা মিলল না? বসে আছে দুজন ছেলে আর দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে বেশ ফরসা, একটু মোটামতন, সবুজ সালোয়ার কামিজ, চোখে চশমা। আর একজন শ্যামলী, ছিপছিপে। তার চেহারায় একটা আলগা চটক থাকলেও দুচোখে কেমন যেন দুঃখ, হীনম্মন্যতা। পরণে তার নীল বুটিদার সাদা জমির শাড়ি। বেশ নার্ভাস হয়ে বসে আছে সে। ও তো ইন্টারভিউ দিয়ে ফেলেছে! তবুও অন্যদের মতো চলে গেল না। ওকে কি অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে? বাকিরা তো ইন্টারভিউ-এর ঘর থেকে সোজা বাইরে চলে গেল। কারও-র দিকে চাইল না। অনেকক্ষণ রগড়েছে কিনা! যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা। এই মেয়েটি এখনই বেরোল ভিতরের ঘর থেকে। অন্য সকলের চেয়ে ক্লান্ত লাগছিল। বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই মুখে, থাকার কথা নয়। বাকিদের চেয়ে ঢের বেশি সময় ধরে তাকে পরখ করা হয়েছে। বেশিক্ষণ বাজিয়ে দেখা হয়েছে বলেই কি তাকে আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে বলা হল? হয়তো পছন্দ হয়েছে কর্তাদের। কিন্তু সেটা যদি জানতে পেরেই থাকে, মেয়েটির মুখ ম্লান কেন?

আর একজন বেরোল। সটান চলে গেল বাইরে। পরের জন ঢুকেছে বাকি থাকল দুজন। সে আর সবুজ সালোয়ার-কামিজ। শেষ ছেলেটি বেরিয়ে চলে যেতেই ডাক পড়ল পৃথুলার। সে শশব্যস্ত উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা একবার দেখে নিচ্ছে, ওড়নাটা গুছোতে গুছোতে দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলতে থাকা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। বেঁচে গেল অথবা মরে গেল।

মরেই গেল, কেন না, মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঈষৎ বিরক্ত এবং বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে ইন্টারভিউ-এর ঘর থেকে বেরিয়ে সেই ফরসা মেয়েটি চশমা খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কারও দিকে না তাকিয়ে বাইরে চলে গেল জোরে পা চালিয়ে।

এবার বিতান আর নীল শাড়ি মুখোমুখি। এখনও ওর নাম ডাকেনি। বায়োডেটা দেখেই বাতিল? নাকি সকলের শেষে ডেকে আচ্ছাসে কচলানো হবে! যাঁরা বোর্ডে থাকেন তাঁদের এটা ফূর্তি বইকি!

যা হওয়ার হোক। ভিতরে ঢুকবার সুযোগ তো পাবেই, একবার লড়ে দেখবে। এই মেয়েটার মতো বাইরে এসে মুষড়ে পড়বে না। কেন বসে থাকল মেয়েটা! একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে দোষ কী? থাকগে! বরং একটু কনসেনট্রেট করা যাক। ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে খেজুরে গপ্পের দরকারটাই বা কী! আর তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এবার তাকে ডাকতেই হবে। বিরক্তিকর অপেক্ষার শেষ। উঠে দাঁড়িয়েই পড়ল।

হ্যাঁ, ঘর থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে ওর নাম ধরে ডাক দিল, শেষ পর্যন্ত। বিতান চুলটা হাতেই একটু সেট করে নিল। বেল্ট

বরাবর গোঁজা শার্টটা হাত চালিয়ে টান করে নিচ্ছে। বসে থাকা মেয়েটির দিকে বেপরোয়া হয়ে এতক্ষণে তাকাল সোজাসুজি। চিলতে হাসি আনল ঠোঁটে। মেয়েটি নির্বিকার। চোখ নামিয়ে নিল। অহংকারী? মোটেই নয়। এখন শরীরিভাষায় এক নিদারুণ সংকোচ। সকলে চলে গেছে, নিশ্চয় তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। আত্মবিশ্বাসী হওয়ারই তো কথা ছিল। মরুকগে!

'মে আই কাম ইন, স্যর?' পর্দা সরিয়ে শুধোল বিতান। মাঝের ঘূর্ণি চেয়ারে বসা টাকমাথার ভদ্রলোক মাথা না তুলে বললেন, 'ইয়েস।' ওঁর চোখ কী একটা ফাইলে।

ওঁর দুপাশে আরও দু'জন বসে আছেন। পরনে এই এপ্রিলেও স্যুট-টাই। ঘরটা স্প্লিট এসি-র কল্যাণে বেশ ঠাণ্ডা বলে রক্ষা। না হলে গরমে ঘেমে নেয়ে একসা হতেন। মাঝের ভদ্রলোক সাদা রঙের স্রেফ ফুল স্লিভ সুতির শার্ট পরে দিব্যি আছেন।

বিরলকেশ ভদ্রলোক বিতানকে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'আরে বসুন!' বলার ভঙ্গি ও সুরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি। যেন বোঝাতে চাইছেন, দাঁড়িয়ে কেন মিছিমিছি।

'থ্যাংক ইউ স্যার' বলে বিতান বসে পড়ল।

প্রথম সহাস্য প্রশ্ন বাঁ-পাশের কালো মত ভদ্রলোকের থেকে, 'দাড়ি কেন?'

বিতান প্রশ্নটার মানেই বুঝতে পারল না। কার দাড়ি? কীসের দাড়ি! চোখ পড়ল পিছনের দেওয়ালে। দুটো বাঁধানো ছবি। ঋষি অরবিন্দ আর রবীন্দ্রনাথের। পরিণত বয়সের ফোটোগ্রাফ। দুজনেরই লম্বা সাদা দাড়ি। ডানপাশের ভদ্রলোকের থুতনিতেও আলতো ফ্রেঞ্চকাট। একটু পরেই আনমনে নিজের গালে হাত বুলোতে গিয়ে ধরতে পারল, অন্য কারওর নয়, তার নিজের দাড়ির কথাই বলা হচ্ছে।

'আমার এই দাড়ি! মানে কাটা হয়নি আর কী!'

ফ্রেঞ্চকাট শুধোলেন, 'ফিটফাট থাকতে ভাল লাগে না?'

'নিশ্চয়। দাড়িটা জাস্ট থেকে গেছে। কোনও কারণ নেই।'

মাঝের ভদ্রলোক শুধোলেন, 'ডাজনট ম্যাটার। এই চাকরিটা পেলে করবেন?'

'নিশ্চয়। সিলেক্টেড হলে খুশি হব।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'ইয়েস। বায়োডেটা দেখলাম। চলবে। আমরা নিতে পারি। মাইনে কিন্তু কম। প্রথমে। পরে কাজ দেখে..'

'কম মানে কত?' বিতানের সংযত কৌতূহল।

'এই বারো-চোদ্দ হাজার আর কী। কাজের কিন্তু চাপ আছে। সেভেন আওয়ার্স।'

'দ্যাটস ওকে স্যর। আমার অসুবিধে হবে না।'

'আপনি জয়েন করলে আমাদের কী সুবিধে হবে?' শুধোলেন বাঁয়ের ভদ্রলোক।

একটু সময় নিল বিতান। ভাবল। প্রশ্নকর্তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'অনেক সুবিধে। আপনারা যে ধরনের কাজ চাইছেন, সেটা আমি ভালই পারি।'

মাঝের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কী ধরনের কাজ চাইব, জানেন?'

'পাবলিশিং হাউস আপনাদের। কম্পোজ করা, লে-আউট।'

'পুরো পেজ মেক-আপ। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। হবে?' ভদ্রলোকের চোখে কিঞ্চিৎ কৌতুক, 'গুলিয়ে ফেলবেন না তো?'

'না, কখনও নয়। প্রথমে হয়তো দারুণ সুন্দর কিছু হবে না। কিন্তু করতে করতেই...'

'ঠিক আছে। এখন কেমন পারেন, একটু দেখে নেব আমরা। অপেক্ষা করুন। ওরিজিন্যাল সার্টিফিকেটগুলো ওঁকে একটু দেখিয়ে নিন।' ফ্রেঞ্চকাটের দিকে ইঙ্গিত।

বোঝা গেল জমা দেওয়া বায়োডেটা পরখ করে এবং কথাবার্তা বলে মাত্র দুজনকে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়েছে। এবার কম্পিউটারে বসিয়ে ডিটিপি এবং লে-আউটের বাহাদুরির মূল্যায়ন। বিতান এ-রকম দেখেনি। আগে ইন্টারভিউ, তারপর পরীক্ষা। অর্থাৎ যাদের পছন্দ হবে না, তাদের সেখানে বসার সুযোগটাই জুটবে না।

সকলে চলে গেছে। পড়ে আছে দু-জন। বিতান আর ওই শাড়ি পড়া মেয়েটি। দুজনকে দুটো ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল।

মেয়েটির কথা জানে না। বিতানের সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছে বিস্তর কাজ। অনেকটা হাতে লেখা ম্যাটার। নির্ভুল কম্পোজ করতে হবে। অর্থাৎ নিখুঁত প্রুফ দেখার দায়িত্বটাও তারই। অতঃপর পিডিএফ ফর্ম্যাটে ম্যাটারটা বড় সাহেবের টেবিলের মেশিনে ট্রান্সফার করতে হবে। ই-মেল অ্যাড্রেস দিয়ে গেছে। উনি কম্পোজটা নিজে দেখতে থাকবেন। সেই অবসরে লেখা তিনটে দুটো ছোট ইলাসট্রেশান দিয়ে এ-ফোর সাইজে সাজিয়ে নিতে হবে। পেজ মেক-আপ সম্পূর্ণ করে প্রিন্ট-আউট বের করে জমা দিতে হবে দেড়ঘণ্টার মধ্যে। কম সময়ে করতে পারলে বাড়তি কৃতিত্ব।

বিতান কাজগুলো জানে। জানে মানে, শিখেছে কিছুদিন। হাত খুব পাকেনি। স্পিড খুব দারুণ কিছু নয়। কিন্তু মন লাগিয়ে কাজটা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনটে ম্যানুস্ক্রিপ্ট কম্পোজ করে মেল করে দিয়েছে। লে-আউটটা একটু সময় নিয়ে করল, যাতে চোখে ধরে। প্রিন্ট-আউটটা নিয়ে একবার পুরোটা চোখ বুলিয়ে নিল। একেই বলে ছাপার ভূত। একটা বানান অন্যরকম করে ফেলেছে। পাণ্ডুলিপির বানান ছিল 'ছোটো', সে করে ফেলেছে 'ছোট'। যাকগে, এক এক হাউসে এক এক রকম বানানবিধি। আর কোনও ত্রুটি চোখে পড়ছে না। কম্পোজ-টা পাঠিয়ে দেওয়াই হয়েছে আগে। তবু স্ক্রিনে পাতাটা এনে মাউসের ক্লিকে যা বানান ছিল, সেটাই রেখে আর একটা প্রিন্ট নিল। দুটো পাতাই জমা দিল— ফার্স্ট প্রুফ এবং ফাইনাল প্রিন্ট হিসেবে। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট সাতেক আগেই।

চারিদিকে দেখল, মেয়েটি তখনও অন্য ঘর থেকে বেরোয়নি অথবা আগেই কাজ শেষ করে চলে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, ওকে ইন্টারভিউ নেওয়ার কর্তারা ফের ডেকে নিয়েছেন।

বিতানকে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হল। সে বেনিয়াটোলার অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজস্ট্রিট ক্রসিং-এ এসে দাঁড়াল। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। আড্ডায়, না বাড়িতে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে চাকরিটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা। এত বড় হাউস। দুজন যদি নেয় তাহলে তো পাচ্ছেই। যদি লেগে যায়...

চমকে উঠল বিতান। কে ডাকছে যেন পিছন থেকে। মেয়ের গলা, 'বিতানবাবু! এই যে মিস্টার সরকার...'

ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক! যার সঙ্গে ইন্টারভিউ দিল, সেই মেয়েটিই। দ্রুত পা চালিয়ে আসছে। সামনে এসে দাঁড়াল।

বেশ মনে আছে মুখটা, তবু বিতান শুধোল, 'আপনি সুপ্রকাশ-এ ইন্টারভিউ দিলেন না?'

'হ্যাঁ তো! এত বড় পাবলিশিং কম্পানি, চাকরিটা কি হবে?'

'আপনাকে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ। জিগ্যেস করেছিলাম।' মেয়েটির এমন ভাব, যেন রেজাল্ট জেনে এসেছে।

'জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল! কে বলল? কী বলেছে আপনাকে?'

মেয়েটি মাথা নিচু করল। হঠাৎ কেন কে জানে, বিতানের মায়া হল মেয়েটির ওপর। এমনভাবে কথা বলছে, যেন মহা অপরাধ করে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।

মেয়েটি বলল, 'অন্যভাবে নেবেন না, এখানে আমার একজন জানাশোনা আছে। বাবার বন্ধুর মত। বিনয়বাবু। বিনয় শিকদার। চেনেন?'

বিতান দু'দিকে মাথা নাড়ে, 'চিনব কী করে?'

'না মানে ... হয়তো আগে সুপ্রকাশ-এ এসেছেন!'

'না না। একেবারে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে... যাকগে, আপনাকে কী বলেছেন আপনার বাবার বন্ধু?'

'উনি বললেন, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের হবে চাকরিটা। ওদের এখন একজন চাই। পরে আরও মেশিন বসলে হয়তো আর একজনকে ডাকা হবে।'

'যাক, আমাদের দুজনেরই ফিফটি-ফিফটি চান্স, বলুন। আর কপাল ভাল থাকলে... চলুন এই খবরটুকুই সেলিব্রেট করা যাক। ওই তো ওপারে দোকান, চা খাবেন?'

'আমি খাওয়াব কিন্তু।'

'কেন? অফার তো করলাম আমি।'

'আমি টিউশন করি।' মেয়েটি বেশ গর্বের সঙ্গে জানায়।

'কত রোজগার করেন?'

'হাজার-বারোশো তো বটেই। কখনও মাসে দেড় দু হাজারও হয়ে যায়।'

'আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কামাই। চলুন।'

'কামাই মানে? চাকরি করেন?'

'চাকরি ঠিক নয়, আমার নিজের একটা ডেসকটপ মেশিন আছে। পুরনো, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড। খুব স্লো। কাজ চলে আর কী! বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ম্যাটার এনে কম্পোজের পর ফ্লপি করে দিয়ে আসি। প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিজের।'

'তাই! পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ হয় কী করে?'

কথা বলতে বলতে মহাত্মা গান্ধি রোডের ওপর মিত্র-ঘোষের আগে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল দুজনে। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করে, 'কাজের অর্ডারগুলো পান কী করে?'

হাসল বিতান। বেয়ারার রেখে যাওয়া গ্লাস থেকে এক চুমুক জল পান করে বলল, 'শুনে অবাক হবেন না কিন্তু। আমি নিজেও একটু লেখা লেখি করি আরকি! অনেক এডিটারের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। আমার কম্পোজটা ওঁরা পছন্দ করেন, ভুলটুল কম থাকে তো!'

মেয়েটির চোখে বিস্ময়। কথা বলতে পারছে না যেন। হঠাৎ বলে ওঠে, 'ওমা, আপনি লেখক! যখন ইন্টারভিউ-এর জন্য ভিতরে আপনাকে নাম ধরে ডেকে নেওয়া হল, তখনই বিতান সরকার শুনে চেনা মনে হয়েছে। ও হ্যাঁ, শুধু কবিতা তো নয় —ইদানিং গল্পও লিখছেন। ঠিক না?'

'ওই আর কী! বলার মত কিছু নয়। পড়েছেন কখনও আমার লেখা?'

'বাঃ, পড়ব না? ইদানিং তো অনেক কাগজেই...'

'হ্যাঁ, বেশিরভাগই লিটল ম্যাগাজিন। বড় কাগজে বিশেষ চান্স পাই না।'

'পাবেন নিশ্চয়। পাবেন।'

'কী করে বুঝলেন। কবিতা আমার নিশ্চয় তেমন করে পড়া হয়নি। আর গদ্যে কলম ধরেছি নতুন। কবিতার ভালমন্দ বোঝেন?'

'খুব একটা নয়। তবে পড়তে ভাল লাগে। আপনার গদ্যটা কিন্তু খুব সহজ। গল্পগুলো তরতর করে এগিয়ে যায়। ভাষার মারপ্যাঁচ থাকে না। নিশ্চয় দাঁড়াবেন একদিন। আশা করাই যায়। বয়স তো কম। চেষ্টা থাকলে...'

'বয়সটা খুব কম নয় কিন্তু। সামনের জুলাই-এ ত্রিশ ছুঁয়ে ফেলব। বেশ কিছুদিন লেগে আছি। ইচ্ছে ছিল শুধু লেখালেখি নিয়েই... যাকগে. আপনার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি এখনও।'

'আমি কুসুম। কুসুম মিত্র।'

'এমন নাম আজকাল বিশেষ শুনি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথা পড়েছেন?'

'পড়তে হয়েছে। বাংলা অনার্সে পাঠ্য ছিল।'

'বাংলাতে অনার্স? উরিব্বাবা! পাশ করে গেছেন?'

'না। পার্ট থ্রি দেব।'

'মতিঝিল। দমদম।'

এর মধ্যে বেয়ারা মেনুকার্ড নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ না বুলিয়েই বিতান বলল, 'বলুন কী খাবেন!'

মেয়েটি সলজ্জ হাসে, 'কিছু না। চায়ের কথা বললেন, শুধু চা।'

'দুৎ, তাই কী হয়?' বেয়ারার দিকে ঘাড় ঘোরাবার আগেই বিতান বলল, 'এখানে কাটলেটটা ভাল বানায়। দুটো কবিরাজি।' অর্ডার দিয়ে ফেলল মেয়েটির সম্মতির অপেক্ষা না করেই।

ছেলেটি চলে যেতে কুসুম বলল, 'আপনাকে রাস্তায় কী জন্যে

'মেয়েটির চোখে বিস্ময়। কথা বলতে পারছে না যেন। হঠাৎ বলে ওঠে, 'ওমা, আপনি লেখক! যখন ইন্টারভিউ-এর জন্য ভিতরে আপনাকে নাম ধরে ডেকে নেওয়া হল, তখনই বিতান সরকার শুনে চেনা মনে হয়েছে।'

পিছন থেকে ডেকেছিলাম, এখনও জিজ্ঞেস করেননি কিন্তু!'

'ও মা, তাই তো! আপনি ডেকেছিলেন বুঝি?' হ্যাঁ হ্যাঁ!'

'চায়ের আড্ডায় যখন নিয়ে এলেন, তখন তো আর আপনি আজ্ঞে চলে না। আমি অনেক ছোট। জাস্ট টোয়েন্টিওয়ান। দেখে অবশ্য বয়সটা একটু বেশিই লাগে, না? আসলে ঘষামাজার সময় তো নেই।'

'সময় নেই মানে? করেন তো কটা টিউশন!'

'শুধু টিউশন? কলেজ আছে। বাড়িতে... থাক, কবিদের বড্ড নরম মন, এত কষ্টের কথা শুনতে নেই।'

ম্লান হাসল বিতান, 'কবিদের এমনিতেই বড় কষ্ট কুসুম। সে তুমি তোমার কষ্টের কথা বল আর না-ই বল! মতিঝিল-এ পড়, মানে তো মর্নিং— তাই না?'

'হ্যাঁ, মর্নিং-এর স্টুডেন্ট। তবে আর কলেজে যাই না। এপ্রিলে তো ফাইনাল পরীক্ষা, তৈরি হচ্ছি।'

'ফার্স্টক্লাস নম্বর... আই মিন, দুটো পার্ট মিলিয়ে সিক্সটি পার্সেন্ট হয়েছে?'

'মাথা খারাপ, আমাকে ভেবেছেন কী? ব্রিলিয়ান্ট ফ্রিলিয়ান্ট কিছু? এক্কেবারে না। অনার্সটকু টিকে গেলেই বর্তে যাব। আপনার কোন সাবজেক্ট?'

'কোনও সাবজেক্টই নয়। জেনারেল কোর্স। কোনওক্রমে ডিগ্রিটা জুটেছে। বললাম না, ইচ্ছে ছিল— শুধু লিখব। চাকরি

বাকরির ধার মাড়াব না।'

'তাহলে আর ইন্টারভিউ দিতে এলেন কেন?'

'যদি চাকরির টাকায় দু চারটে নিজের বই ছাপাতে পারি। কম্পোজের খরচ তো লাগবে না। অল্পে হবে।'

কথার মধ্যেই দুই প্লেটে দুটো পেল্লাই কবিরাজি কাটলেট নামিয়ে রেখেছে বেয়ারা। জিজ্ঞেস করল, 'চা, না কফি?'

কুসুম বলল, 'চা চা। কফি টফি লাগবে না।'

বিতান শুধোয়, 'কেন, কফি চলে না?'

কুসুম ওর ডাগর চোখদুটো তুলে বলল, 'চা বলুন। ওতেই হবে।'

'ওতেই হবে মানে? অর্থাৎ কফিতে অরুচি নেই, তাই তো!'

বেয়ারাকে দু কাপ কফি আনতেই বলল বিতান। যেন একটু পরে আনে! খানিক জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে কাটলেটটা খাওয়া যাক।

কুসুম শুধোল, 'সন্ধে হয়ে আসছে। আপনার দেরি করিয়ে দিলাম না তো?'

'দেরি করিয়ে দিলে ঠিকই। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।'

'কেন দেরি মানেই তো ক্ষতি।'

'দেরি মানে কখনও লাভও হতে পারে।'

'কী লাভ?'

'তোমার সঙ্গ।'

মেয়েটির শ্যামলা মুখখানাও কেমন লালচে হয়ে উঠল। 'আপনার কেউ নেই বুঝি?'

'কী মনে হয়?'

'সেটা আবার বলা সম্ভব নাকি! বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে? কবিদের বন্ধুনির তো অভাব থাকে না।'

'আমার খুব অভাব। এখন।'

'তার মানে, ছিল।'

'প্রথম দিনের আলাপেই সব জেনে নেবে? বেশ! হ্যাঁ, ছিল।'

'ছিল বলছেন কেন?'

'এখন সে নেই বলে!'

'কেন নেই?'

'বিয়ে হয়ে গেল যে!'

'বিয়ে করতে দিলেন কেন?'

'দিলাম কেন না, জানি —কবিদের সঙ্গে বড়জোর বন্ধুত্ব করা চলে, বাঁধনে জড়ানোটা বোকামি। কবিবন্ধু লোককে দেখানোর জন্যে অহংকার, কিন্তু জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার পক্ষে অচল। কবির বউ হলে কষ্ট সারাজীবন। কোন মেয়েই বা সেটা চায়!'

'অ্যাঁ! বন্ধুত্ব পাতানো যায়, আর বিয়ের বেলা দোষ?'

'বন্ধু আর বর তো এক নয়।'

'বন্ধু থেকে কেউ কেউ বর হয়ে যায় না?'

'যেতে পারে। যায় হয়তো কেউ কখনও। কিন্তু তাকে আর তখন বন্ধুবর বলা যায় না। বন্ধুত্বটা ফিকে হয়ে গিয়ে আইন মোতাবেক বরত্ব-টাই বড় হয়ে পড়ে।'

'তাই আপনি বর হতে চান না।'

'একেবারেই না।'

'মনের মতো মেয়ে পেলে?'

'আজীবন বন্ধু হয়ে থাকব।'

'এ-কথা মেয়েরা জানলে কেউ কাছে আসবে না আপনার।'

কাটলেট শেষ। কফিতে চুমুক দিয়ে কুসুম বলল, 'আমি কেন ডাকলাম তখন, এখনও বলিনি।'

'সময় তো হয়ে এল। বলে ফ্যালো। এবার তো উঠতে হবে।'

'হ্যাঁ বলি। বলেই ফেলি। আপনি আজকের এই চাকরিটা পেলে সত্যিই কি করবেন?'

'নয় কেন? বারো চোদ্দ হাজার টাকার চাকরি কি ফেলনা।'

'আপনার কাছে হয়তো ফেলনাই!'

'যাবাব্বা, কেন?'

'বললেন যে, বাড়িতে বসে কম্পোজ টম্পোজ করে আপনার ভালই ইনকাম...'

'ভাল তো বলিনি। রোজগার হয় বলেছি। চাকরিটা হলে কত সুবিধে মাস গেলে নিশ্চিত আয়।'

'সত্যিই চাকরিটা কি আপনার খুবই দরকার।'

'চাকরির আবার কার দরকার নেই। ক বছর পর বয়েসটা পেরিয়ে গেলে, তখন?'

'আপনি আরও ভাল কাজ পেতে পারেন।'

'আর তুমি?'

'বাবার কম্পানিতে ক মাস হল লকআউট। মা অসুস্থ। না হলে ফাইনাল পরীক্ষার আগে কেউ এমন চাকরি খোঁজে?'

'কোথায় থাকো?'

'নাগের বাজারের কাছে। একটা বস্তিতে। গেলে চমকে উঠবেন। বাবার এক বন্ধু বলেছিল, ডিটিপি- ডিপ্লোমাটা যখন আছে, মালিককে বলে কয়ে ঢুকিয়ে দেব।'

বিতান হাসল, 'তো ঢুকিয়ে দিক না! আপত্তি কোথায়?'

কুসুমের ঠোঁটে ছুঁয়ে থাকা আলতো হাসিটা ম্লান হয়ে ওঠে, 'ওঁরা আপনার মতো চৌকশ ক্যান্ডিডেট পেয়ে আমাকে বলেছে, প্যানেলে নাম থাকবে। মানে, পরে যদি দরকার হয়।'

'আমাকে যে বলল, দরকার এখনই!'

' সে তো আপনাকে। আপনার কম্পোজের কাজ দেখে। যাকগে! সত্যিই তো আমি সবে শিখেছি। আমার তো অমন স্পিড নেই। পাতা সাজাতেও জানি না।'

'তাহলে?' বিতানের মুখে আর কথা সরে না।

কুসুম দু চোখে কান্না মাখিয়ে হাসল, 'তখন ফিফটি-ফিফটি চান্সের কথা বলছিলেন না, আসলে চাকরিটা আপনারই হচ্ছে। কাল পরশুর মধ্যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবেন।'

'যদি জয়েন না করি!'

'সে তো হবার নয়। তখন আমার শিকে ছিঁড়বে।'

বিতান রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে বলল, 'শিকে তোমারই ছিঁড়ল। কারণ, আমি চাকরিটা করছি না। নিচ্ছি না আর কি!'

'দয়া করছেন?' ঠোঁটে হাসি সত্ত্বেও দু ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'ঠিক তা নয়, কুসুম। আমি আজ সকালেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি। গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং-এর এক প্রেসে। শেয়ালদার কাছেই। মাইনে আঠেরো হাজার। কাজের চাপ কম। কবিতাকে বিদায় করতে হবে না।'

'আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যে বানিয়ে বলছেন কেন? আমি তো বন্ধু!'

হাসল বিতান, 'বেশ যদি বানিয়েই বলি। ক্ষতি কী? তুমি তো আমাকে চাকরিটা নিতে নিষেধ করতে! বুঝতে পেরেছিলাম। তাই এই রেস্তোরাঁতে তোমার একটা ইন্টারভিউ নিলাম। তুমি পাশ করে গেছ। চাকরিটা তোমারই হবে। সত্যি কথাটা বলি, ওই অফিসেই তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, চাকরিটা তোমার খুব দরকার।'

'কী করে বুঝলেন?'

'আমি যে কবিতা লিখি কুসুম। মেয়েদের... শুধু মেয়েদেরই বা কেন, মানুষের চোখ পড়তে পারি যে।'

ব্যথা নিয়ন্ত্রণ

পুজোর ক'দিন ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে হবে, নবমীর দিন অংশ নিতে হবে ধুনুচি নাচে, গাড়ি চালানোর সময় দীর্ঘক্ষণ জ্যামে ফেঁসে থাকতে হবে। আর উল্টোপাল্টা খাওয়া দাওয়া তো আছেই। এ সবে খুশির সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে দেখা দিতে পারে ব্যথা। ঘাড় থেকে শুরু করে কোমর, হাঁটু, পায়ে, ও পেটে এমনকী মাথা ব্যথা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কীভাবে এই সব ব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে পুজোর দিনগুলো পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন সে বিষয়ে জানাচ্ছেন ইন্ডিয়ান পেন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট **ডাঃ গৌতম কুমার দাস**

ব্যথা যখন পায়ে

এখন অনেকেরই হাঁটার অভ্যাস কমে গিয়েছে। ফলে খানিকক্ষণ হাঁটলেই পা ব্যথা হয়। কখনও গোড়ালিতে কখনও বা পায়ের পাতায়। অথচ পুজোয় ঠাকুর দেখতে হলে একটু হাঁটতেই হবে। সঙ্গে ভি ভি আই পি পাস থাকলেও প্যান্ডেলের অনেক আগে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড ঝোলে। অতএব হাঁটা ছাড়া গতি নেই। হাঁটার জন্য অনেকেরই ব্যথা হতে পারে পায়ের গোড়ালিতে, বিশেষ করে, যদি হিল তোলা জুতো পরা হয়। মহিলাদের এই সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি। আর হিল যত সরু হবে সমস্যা তত বেশি। কাজেই এই ব্যথা থেকে দূরে থাকতে কম হিল তোলা জুতো পরা দরকার। আর হিল বেশি হলে শুধু গোড়ালিতেই নয়, পুরো পা এমনকী কোমরে ব্যথাও হতে পারে। কাজেই হাই হিল ছেড়ে যে জুতোয় স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ নরম চামড়ার জুতো পরে ঠাকুর দেখতে বেরনো দরকার। আর ব্যথা হলে একটু বিশ্রামে থাকলে এবং জুতো পাল্টালেই এর সমাধান সম্ভব।

হিল পরে রাস্তায় বেরিয়ে কোনও খানা খন্দে পা পড়লে আর কথা নেই। পা মচকেও যেতে পারে। তেমন হলে সোজা বাড়ি ফিরে পা-দুটো বিশ্রামে রাখতে হবে। আর বরফ সেঁক দিতে হবে, প্রয়োজনে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেলে উপকার পাবেন। যাঁদের শরীরের ওজন বেশি তাঁরা বেশি হাঁটাহাঁটি করলে হাঁটুতে চাপ পড়ে ব্যথা বাড়তে পারে। এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে অস্টিওপোরেসিস থাকলেও। কাজেই ঠাকুর দেখতে বেরনোর আগে এসব বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। হাঁটতে হবে বুঝে শুনে।

ব্যথা হতে পারে কোমরেও

দীর্ঘক্ষণ প্যান্ডেলে ঢোকার লাইনে দাঁড়ানো কিংবা অনেকক্ষণ বসার সুযোগ না পেলে কোমরে ব্যথা হতেই পারে। কোমরে যাঁদের সমস্যা আছে তাঁদের ব্যথার আশঙ্কা বাড়লেও অন্যান্যদেরও

এই অভিজ্ঞতা হতে পারে। যদি ব্যথাটা শুধু কোমরে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তেমন চিন্তার কিছু নেই। কোমর একটু বিশ্রামে রাখলে একভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে আশপাশে জায়গা খুঁজে একটু বসে নিলে এমন সমস্যা তেমন গভীর হতে পারে না। কোমরে ব্যথা হতে পারে অনেকক্ষণ গাড়ি চালালেও।
সাময়িকভাবে এই ব্যথার জন্য তেমন ওষুধপত্রের প্রয়োজন হয় না। একটু বিশ্রামে থাকলে কিংবা তেমন বেশি ব্যথা হলে প্যারাসিটামল জাতীয় একটা ওষুধ খেয়ে নিলেই আবার পরদিন বেরিয়ে পড়া যায়।
কোমরে ব্যথার উপসর্গ যদি অল্প কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে থাকে তাহলে একটু সতর্কভাবে ঘোরাঘুরি করা দরকার। বিশেষ করে যদি ব্যথাটা কোমর থেকে পা, গোড়ালি, এমনকী আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করা চলবে না। আর কোমরের মধ্যেই ব্যথা সীমিত থাকলে একে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ঠাকুর দেখার মজা উপভোগ করুন পুরোদমে।

ঘাড়ে ব্যথাও অস্বাভাবিক নয়

অনেকে রাতভোর ঠাকুর দেখার উদ্দেশে বেরনোর সময় টুকটাক খাবার, জল, আবার দুম করে যদি বৃষ্টি নামে তাই ভেবে ছাতা কাঁধের সাইড ব্যাগে নিয়ে বেরন, দীর্ঘক্ষণ কাঁধের এই বোঝা থেকে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে, আবার উঁচু উঁচু প্যান্ডেলের কারুকাজ, লাইটের খেলা দেখতে দেখতেও এই সমস্যা হতে পারে। অন্যদিকে যাঁরা গাড়ি চালান একভাবে বসে থেকে তাঁদের ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে কাজেই এ ধরনের ব্যথা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে কাঁধের ব্যাগে নয়, জল, খাবার, ছাতা ইত্যাদি ক্যারি করুন হাতে। আলোর ভেলকি, প্যান্ডেলের সৌন্দর্য উপভোগ করুন যতটা কাঁধ সহ্য করতে পারে ততটাই। জোর করে উঁচু হয়ে দেখা, বা ঘাড় বেশি ঘুরিয়ে কাঁধ উঁচু করে দেখার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ কাঁধের ব্যথার উৎসকে প্রথমেই দমন না করলে আরও বহু সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যথা তখন কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠে নামতে পারে। সঙ্গে দেখা দিতে পারে মাথা ঘোরা, হাতে ঝিনঝিন ভাব এমন উপসর্গ। তাই ঠাকুর দেখুন, কিন্তু কাঁধ সামলে। তা সত্ত্বেও একটু আধটু সমস্যা হলে ঘাড়ে একটু সেঁক দিন। প্রয়োজনে ব্যথা কমানোর হালকা কোনও ওষুধ খান, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর চলাফেরার সময় কাঁধটা হালকা করে মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ঘোরান। উপকার পাবেন।

মাথাব্যথাও সাধারণ সমস্যা

চারদিকে ঝলমলে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য যে কারও মাথা ব্যথা করতে পারে। যাঁদের মাইগ্রেন আছে তাঁদের তো কথাই নেই। প্রচন্ড আলোতে একদিন বেরিয়েই তাঁদের হয়তো ঘর বন্দি হতে হয়। কাজেই মাইগ্রেন থাকলে বেশিক্ষণ উজ্জ্বল আলোয় থাকা অনুচিত। সমস্যা হলে মাইগ্রেনের চিকিৎসা চালানো দরকার।

পেট ব্যথারও আশঙ্কা বাড়ে

পুজোর ক'দিন খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে সাধারণ ব্যাপার। কেউ সকালের দিকে উপোস করে অঞ্জলি দিতে গিয়ে একবেলার খাবার স্কিপ করেন, তো কেউ তিনবেলা কবজি ডুবিয়ে রেস্তোরাঁয় খাবার খায়, কেউ বা রাস্তার রোল, চাউমিন, ফুচকার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেন না। খাওয়া দাওয়ার এই অনিয়ম থেকে পেটে গ্যাস ফর্ম করে, অতিরিক্ত অ্যাসিডিটির কারণে কিংবা বাইরের খবার থেকে কোনও সংক্রমণ হলে পেটে ব্যথা হতে পারে। বদহজমের জন্য হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সচেতনতাই পারে পেট ব্যথা থেকে আপনাকে দূরে রাখতে। যা যা করণীয় তা হল রাস্তার খোলা খাবার যতই লোভনীয় হোক না কেন, তা না খাওয়া, ভরা পেটে খাবার না খাওয়া, কোনও মিল স্কিপ না করা, সারা রাত ঠাকুর দেখার সময় গুরুভোজ বা মশলাদার খাবার না খাওয়া। যাঁদের একটু আধটু অ্যাসিডিটির ধাঁচ আছে তাঁরা অ্যান্টাসিড জাতীয় কোনও ওষুধ প্রয়োজনে এক আধটা খেতে পারেন। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

লক্ষ্মী সোনা...

চঞ্চলা, চপলা, বহুবল্লভা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সোনা শব্দটা কীভাবে জুড়ল ভেবে পাচ্ছিলেন না। দেবীর উৎসকথা খুঁজতে ইতিহাস পুরাণ ঘেঁটে আরও নাজেহাল। কী বাণিজ্যে, কী বসতিতে যে দেবীর অবস্থান অপরিহার্য ঠাকুরের আসনে, তাঁর ঝাঁপি খুলতে গিয়ে এভাবে যে এতকিছু বেরিয়ে পড়বে বিলকুল ভাবেননি **প্রীতিকণা পালরায়**

সেই দুধে বয়স থেকে শুরু, এখনও চলছে...! একদম non-veg একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি, তাই স্বভাবমতো শুরু করলেও শূন্যস্থানটা পূরণ করতে নিজেই থামলাম। বেলাইন বকা চিরকালের বাতিক। ইদানীং তার বকুনি খেয়ে খেয়ে অবশ্য মহা সতর্ক আমি। তাই মনে মনে সংযত হওয়া। তবু প্রসঙ্গ ঘোরাতে গেলেও ওই দুধে বয়সেই ফিরতে হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, ওই বয়স থেকে বেয়াড়া ছিলাম না আমি। তাই সদ্য ফোটা কখানি দাঁত দেখাতে বললেই কয়েকটা ছিটকোনো দাঁত আর অনেকটা মাড়ি বের করে সঙ্গে সঙ্গে হাসতাম আর আমার ঠাকমা সেই হাসি দেখে আকণ্ঠ গদ গদ বলে উঠত... 'লক্ষ্মী সোনা!' একটু বড় হতেই স্কুলে ভর্তি। রোজকার হোমওয়ার্ক। এমনিতে বাধ্য আমি, কখনও মর্জিতে আটকে বেঁকে বসলে মায়ের আদুরে অনুরোধ থাকত... 'লক্ষ্মী সোনা...!' স্কুলের উঁচু ক্লাসের দিকে যখন, পড়াশোনা ছাড়াও Co-curricular কাজকর্মে প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুমহলে, নিজেদের কাজকর্ম করিয়ে নিতে বন্ধুদের গাল টেপা... 'লক্ষ্মী সোনা'...। এরপর কলেজ। প্রিয় বান্ধবী তার প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে সন্ধেটা কাটাতে যাচ্ছে আমার বাড়ি আসার নাম করে, সুতরাং সনির্বন্ধ অনুরোধ, 'লক্ষ্মী সোনা...।' বেশ পরবর্তীতে আমার সবটুকু উজাড় করে দেওয়া প্রিয় প্রেমিকটির আমার প্রতি প্রতিদিনকার বার্তা... 'ফোনটা রাখ। কাজ করতে দে, লক্ষ্মী সোনা...।' ভাবছেন এই অবধি? না। এখনও চলছে... Last but not the least, আমার মেয়ে! সাধ্যমতো ধূর্ততায় কখনও পেরে না উঠলে যে ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করে... দুগালে চকাস চকাস চুমু আর গলায় জড়ানো আবদারে... 'মা... লক্ষ্মী সোনা...!'

লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
মার্ব্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।

লক্ষ্মীর পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র

ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতনাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা
গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ।।

লক্ষ্মীর ধ্যান মন্ত্র

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-শৃনিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম।।
গৌরবর্নাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম।
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

দেব-দেবী নিয়ে মস্করা করার মতো মনের জোর যে আমার নেই, যাঁরা আমায় চেনেন, তাঁরা জানেন। এই মুখবন্ধটি লিখতে যে আমি অপারগ হলাম, তার কারণ 'বিষয়'-এ ঢুকতে গিয়ে এই শব্দ যুগলই সবার আগে মনে এবং মাথায় ঘুরতে লাগল। মহা ফাঁপরে পড়া আমি তারপরেই ভাবতে বসলাম আচ্ছা, সেই দুধে বয়স থেকে আজ অবধি কেউই কি খুব সচেতনভাবে ওই শব্দ যুগল ব্যবহার করেছে? নাকি গোবর গনেশ, ক্যাবলা কার্তিক, ন্যাকা সরস্বতী'রই আরও একটা অভ্যস্ত প্রয়োগ ওই লক্ষ্মী সোনা? না হলে স্বভাব চঞ্চলা, চির চপলা, বহু বল্লভা (সবকটা বিশেষণ পুরাণ এবং বিশ্বস্ত গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত!) দেবীর নামের সঙ্গে 'সোনা' শব্দটা কীভাবে জুড়ল? চঞ্চলমতি, অস্থিরচিত্ত, বহু প্রণয়ীর অঙ্কশায়িনী কাউকে কি আমরা 'সোনা' সম্বোধন করি?! ... আর ভাবলাম না। আমারও প্রাণে ভয় আছে। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ আছে। বিত্তের দেবী তিনি। শ্রী এবং ঐশ্বর্যের দেবী তিনি, সমৃদ্ধির দেবী তিনি। তাবৎ বিশ্বের সমস্ত মানুষকূল যা কিছু করে থাকে তাদের জীবদ্দশায় তা এসব অর্জনের জন্যই। আমিও মনুষ্যকূলের মধ্যেই পড়ি। দেব-দেবীর মাহাত্ম বোঝা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কর্ম নাও হতে পারে। তাই বিপথগামী মনকে চেনা পথে ফেরালাম।

দিন আনি দিন খাই থেকে আনা-খাওয়ার হিসেব থাকে না যে পরিবারে, সর্বত্রই পূজ্যতে দেবী লক্ষ্মী। শাস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার কোজাগর লক্ষ্মীপুজো ও দেওয়ালির লক্ষ্মীপুজোর জনপ্রিয়তা বেশি থাকলেও খন্দপূজা নামে পরিচিত ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসের বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠেয় লক্ষ্মীপুজোরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। এছাড়াও কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলায় লক্ষ্মীর নানারকম ব্রতেরও জনপ্রিয়তা আছে। অধিকন্তু লক্ষ্মীবার নামে পরিচিত বৃহস্পতিবারেও সম্বৎসর ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা দেবীর পুজো করে থাকে। লক্ষ্মীর আসন পেতে, আসনে ঘট, কড়ি, সিঁদুর কৌটো, লক্ষ্মীর ছবি এবং লক্ষ্মীর বাহনরূপে জনসমাজে প্রসিদ্ধ পেঁচার মূর্তি রাখা হয়। ধূপ-ধুনো-প্রদীপ সহযোগে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়া হয়। লক্ষ্মীপুজোর আরও একটা প্রধান অঙ্গ হল আলপনা। এই আলপনার নকশায় যেমন থাকে নানা লতা, পাতা, পদ্ম, তেমনই অবশ্যাম্ভাবীভাবে থাকে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পেঁচা এবং ধানের ছড়া। প্রতিটি লক্ষ্মীপুজোর প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সুন্দর সব ব্রতকথা আছে। এর মধ্যে দেওয়ালির লক্ষ্মীপুজোর শুধু একটা বিশেষ বিশেষত্ব আছে। কালীপুজো এ সময়ের প্রধান উৎসব হলেও লক্ষ্মীপুজোর ব্যবস্থা বেশ প্রাচীন ও ব্যাপক। তবে এদিন অলক্ষ্মী ব্রত পালন করা হয় সবার আগে। বাংলার পুররমণীরা পুজারীকে দিয়ে অলক্ষ্মী বিদেয় করেন। এই দেবীর মূর্তি গোবরে তৈরি একটা পুতুল। বাঁ হাতে গড়া হয় এই মূর্তি। চোখ বানানো হয় দুটো কড়ি দিয়ে। মাথার চুল তৈরি হয় মেয়েদের ফেলে দেওয়া ছেঁড়া চুল দিয়ে আর সারা গায়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয় কুলের বীজ। মূর্তিটিকে কোনওভাবেই ঘরের ভিতর আনা হয় না। বাড়ির বাইরে কুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মী পুজো হয়। পুরোহিত বাঁ হাতে কিছু ফুল ছুঁড়ে না তাকিয়ে পুজো শেষ করার পর তাকে ঢেকে রাখা হয় একটা ডালা বা ধামা দিয়ে। এরপর তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে ধামার ভেতর থেকে মূর্তিটি বের করে রাস্তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং কেউ একজন বাঁ হাতে কাটারির কোপ বসিয়ে দু-আধখানা করে দেয় মূর্তিটিকে। সকলে তখন সমস্বরে বলতে থাকে,

অলক্ষ্মী কেউট্যে আলাম
মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন।

এই অলক্ষ্মী দারিদ্র ও অনাহার দূর করে বলে সকলের বিশ্বাস। অলক্ষ্মী দূর করার পর শুরু হয় মূল লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মী পুজোয় তুলসী, ঝিন্টি ও কাঞ্চন ফুল ও ঘন্টা-বাদ্য বর্জনীয়।

বাঙালির চালু বিশ্বাসে এবং কল্পকথায় লক্ষ্মী শিব-দুর্গার মেয়ে। সরস্বতী তার বোন। কার্তিক এবং গণেশ তার দুই ভাই। কিন্তু ঘটনা হল লক্ষ্মীদেবীর উৎস এবং বিবর্তন কাহিনি আকর্ষণীয় রকমের বিচিত্র। কোজাগরী পূর্ণিমায় যে লক্ষ্মীর আরাধনা হয় বাঙালির ঘরে ঘরে, পৌরাণিক লক্ষ্মীর সঙ্গে তার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কোজাগরী, লক্ষ্মীর ব্রতকথায় দুই লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব বর্ণিতও হয়েছে খানিক। পুরাণ মতে লক্ষ্মী দেবসেনারূপে যখন জন্মান, তখন তিনি স্কন্দ ওরফে কার্তিকের স্ত্রী। 'মন্ত্রমহোদধি' গ্রন্থে

তাকে গণেশপত্নী হিসেবেও উল্লেখ করা আছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমৈথুন মূর্তিতে গণেশকে দেখা গেছে একাধিক প্রাচীনতর গ্রন্থে। পরবর্তীতে অগ্রসর সমাজে ভাই-বোনের বিবাহে 'ট্যাবু' থাকায় অনেক ধনতাত্ত্বিক লক্ষ্মীকে দুর্গা-কন্যা হিসেবে স্বীকারও করতে চাননি। তবে আদিমতর সমাজের অনেক গোষ্ঠীতে এ সমস্ত 'ট্যাবু' না থাকায়, লক্ষ্মী-গণেশ যুগল ঘনিষ্ঠতা দিব্যি চালু ছিল। বৈদিক লক্ষ্মী শস্য-সম্পদের দেবী নন। নদীরূপা সরস্বতী যেখানে উর্বরা পলিমাটির উৎস বলে উর্বরতা ও শস্যের দেবী হিসেবে তাঁকেই মানা হত। আর ঋক, শুক্ল, যজু, এবং অথর্ববেদে লক্ষ্মী এবং শ্রী নামে দুই দেবীকে কল্পনা করা আছে, যাঁরা সৌন্দর্য ও সম্পদায়িনী। বিভিন্ন পুরাণের কথা ক্রমে ক্রমে মিলে গেছে। এবং এক সময় ভৃগু মুনি ও খ্যাতির কন্যা বলেও পরিচিতা হয়েছেন লক্ষ্মী। এরপর বৈদিক বিষ্ণু ও সূর্য দেবতা যখন এক বলেই কল্পিত হয়েছেন তখন সরস্বতী-ঊষা-লক্ষ্মী-শ্রী এঁরাও মিশে গেছেন এবং লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে সমীভূত হওয়ার পর তাই স্বাভাবিকভাবেই শস্যদেবী হিসেবেও পূজিত হতে লাগলেন। এইখানেই লক্ষ্মী ও পৃথিবীদেবীও অভিন্ন বলে ধার্য হতে শুরু করলেন। বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণু পৃথিবীদেবী অর্থাৎ বসুমতীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অতএব শস্যদায়িনী বসুমতী ও শস্যদেবী লক্ষ্মী উভয়েই যখন বিষ্ণুপত্নী, তখন দুজনে খুব সহজে এক হয়ে গেলেন।

এবার লক্ষ্মীই যদি হন দেবী বসুন্ধরা, তাহলে যারা পৃথিবীর আদিম মানুষ সমুদ্র থেকে মৃত্তিকা অর্থাৎ বসুমতীর জন্মের যে কল্পনা করেছেন তা বেশ বাস্তবসম্মত। সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই অতএব গড়ে উঠল পুরাণ কথা। রাষ্ট্র বিভেদে কল্পনার সামান্য তারতম্য থাকলেও মূল ভাবনা ভীষণই কাছাকাছি। ইন্দ্রের ঐরাবত মুনি দুর্বাসার দেওয়া মালা ছিঁড়ে ফেললে মুনির শাপে ইন্দ্র হয়ে গেলেন লক্ষ্মী পরিত্যাজ্য। লক্ষ্মী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রতলে। বিশ্ব চরাচরের সব শস্য-পুষ্প-বৃক্ষ গেল শুকিয়ে। শেষ অবধি দেবতারা অসুরদের সঙ্গে প্রাথমিক সন্ধি করে এবং অবশেষে তাদের প্রতারিত করে বাসুকী নাগ ও মন্দার পর্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত ভান্ডসহ দেবীকে সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং ফিরিয়ে আনেন শ্রী, উর্বরতা, সমৃদ্ধি। ধনদেবী লক্ষ্মীর বিত্তের প্রতীক হিসেবে সমুদ্রজাত কড়ির ব্যবহারের সূত্রপাত এ ঘটনা থেকেই শুরু। কড়ির দুই পিঠের নারীত্ব সূচক প্রত্যঙ্গদ্বয়ের অনুরূপ আকৃতিও মাতৃদেবীর দ্যোতনা প্রকাশ করে।

একটা ঐতিহাসিক reference এই পুরাণকথার সঙ্গে খানিক মিলে যাচ্ছে। Globalisation যখন হয়নি তখন ভাবনা-কল্পনার জটিলতাও তো তৈরি হয়নি। তাই দূরত্বে থাকলেও বিশ্বাসে বিশেষ তারতম্য বোধহয় ঘটত না। কাছে থেকেও যা এখন প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে আমাদের জীবনে! প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেন-দেন যে ছিল তার প্রমাণ তো আছে। হতে পারে সে কারণেই দুই দেশের কল্পনা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে দেবী ভেনাস-ইস্তার-এর ঘটনার সাযুজ্য অন্তত তাই বলে। বরাহের আক্রমণে ইস্তারের প্রেমিক তাম্বুজ নিহত হলে, দেবী তাকে খুঁজতে পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন। দেবীর অনুপস্থিতিতে একই অবস্থা হয়েছিল মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে। প্রাচীন মেসোপটেমীয় পুরাণে দেখা যায়, এরপর শস্যদায়িনী ওই দেবীকে দেব-নর নির্বিশেষে সকলে আরাধনা করে ফের মর্তে ফিরে আসার জন্য। গ্রিক-রোমক সংস্কৃতিতে ভেনাসের বিবসনা মূর্তিতে, শ্রী ও সম্পদ দান করতে ঝিনুকের ভেলায় ভেসে, ফের পৃথিবীতে ফিরে আসা গ্রিক পুরাণ কথায় আছে। দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ সবাই তাঁকে বন্দনা করেছিলেন তখন। লক্ষ্মীর সমুদ্র থেকে উঠে আসার ভারতীয় পুরাণ কথার সঙ্গে এই গ্রিক পুরাণের মিল নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। এমনকী মহাবলীপুরম-এর মন্দিরগাত্রে সমুদ্রোহিতা সামান্য লক্ষ্মীদেবীকেও একই রকম বিবসনা দেখা যায়। ভেনাসের মতোই দ্বি-ভুজা তিনি। এই নগ্নতা শস্য-উৎপাদন কেন্দ্রিক উর্বরতার ভাবনার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ ধরে নেওয়া যায়। এছাড়াও আদিতে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ছিল না। গ্রিক দেবী এথেনার পেঁচাই সম্ভবত লক্ষ্মীর পেঁচায় পরিণত হয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাসও কম আকর্ষক নয়।

সমুদ্রমন্থনের মিথ-এ দিকনাগ (হাতি) কর্তৃক দেবী বন্দনার পরিপ্রেক্ষিতেই কালক্রমে তাঁকে হস্তীবাহনা গজলক্ষ্মীতে পরিণত করেছে। 'কমলেকামিনী' রূপেও বাঙালির ঘরে ইনি পরিচিত। লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মের যোগাযোগটা ঘটেছে কেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সূর্য যেহেতু পদ্মকে বিকশিত করে, সেকারণেই বিষ্ণুরূপী সূর্যের শক্তিরূপিনী লক্ষ্মী ও পদ্ম অভিন্ন হয়েছে পরবর্তীতে। কুনিন্দ রাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মীকে আবার হরিণমাতৃ সিংহবাহনা রূপে পাওয়া গেছে। এর থেকেই তাঁকে দুর্গার কন্যারূপে কল্পনায় দেখা গেছে। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী সিংহ অথবা ময়ূর আরূঢ়া। কার্তিক পত্নী হিসেবে তাঁকে ভাবনার কারণে এটা হতে পারে। শশাঙ্কের মুদ্রায় লক্ষ্মী হংসবাহিনী। সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কল্পনা থাকতে পারে এক্ষেত্রে। নেপালের পটচিত্রে তিনি কূর্মবাহিনী। সাঁওতালি পুরাণে কচ্ছপের পিঠে চড়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসার কাহিনি থাকতে পারে এর পিছনে। পেঁচা এসেছে এর পরে! রাত জাগা এই পাখিকেই শস্যক্ষেত্রের এবং ধন-সম্পত্তির উপযুক্ত প্রহরী বলে মনে করা হয়েছে হয়তো। কোজাগরীও আমলে তো ওই শস্য পাহারার ভাবনাই। এই যে আমার ভাবনার 'স্থিরতা' নেই বলে নিরন্তর কথা শুনতে হয়, তা সে পরম্পরারই অবদান, কেউ কি বুঝবে এবার?

'কথা' এবং 'বকুনি' শোনার ক্ষেত্রের অভাব যে আমার জীবনে নেই, তার আরও একটা প্রসঙ্গ টানি। এই যে চারপাশে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার প্রবণতা দেখে ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যাই, পরিচিতের বৃত্তের পরিধিটা ক্রমশ ছোট করে ফেলি আর দাবিয়ে রাখা ক্ষোভ, বিক্ষোভের আকারে উগরে দিই রাতের টেলিফোনে এবং ফের সেই অবধারিত বকুনিই খাই তার পরম্পরার মূল কিন্তু আবার শুধু 'মানবিক' নয়, খানিক 'দৈবিক'ও দেখি! 'বুদ্ধিজীবী' দেবতাদের দ্বারা 'শ্রমজীবী' অসুরদের প্রতারিত হয়ে অমৃতবঞ্চিত হওয়া থেকে যা শুরু। বিত্ত-সম্পদের দেবী বলে শ্রেণী সমাজের কল্পনায় লক্ষ্মীও সাধারণত ওপর তলার বিত্তবানদের স্বার্থই রক্ষা করে থাকেন। কৃষি বা বাণিজ্য জীবিকার মাধ্যম যাই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে থাকে লক্ষ্মীর অধিক কৃপাধন্য হন তাঁরাই। বিত্ত-সম্পদ উপচে পড়ে তাদেরই ঘরে। আর নিচুতলার সাধারণ মানুষ শুধু তাঁর 'আকাঙ্খা' করে যায় মাত্র। একদিন, কোনও একদিন তারাও যাতে হতে পারে বিত্ত-সম্পদের অধিকারী! ভক্তি বা ভয়ে নয় দেব কূলের মধ্যে খানিক ব্যতিক্রমী আরাধনা প্রাপ্ত হন তাই দেবী লক্ষ্মী। এক অর্থে তিনি যেমন তাই আকাঙ্খার অধিদেবী তেমনই রূপকার্থে এই যে নানা দেবতার পত্নী হিসেবে তাঁকে নানা সময়ে ভাবা হয়েছে, তার ব্যাখ্যাও প্রায় একই। তিনি বরাবর তাঁরই অঙ্কশায়িনী যিনি ঋদ্ধি এবং শক্তির অধিকারী! ... এরপরও চারপাশটা দেখে ক্ষোভ কিংবা বিক্ষোভ কিছুই হওয়াটা হয়তো বোকামিই। কার শ্রী চরণে নিত্যদিন আশ্রয় খোঁজেন! তবে এরপরও আপনি কী করবেন আপনার ব্যাপার। শুধু কাউকে 'লক্ষ্মী সোনা' বলার আগে please দু-বার ভাববেন।

প্রাণযজ্ঞ

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

যার বাবার ক্যানসার তার মনে এত ফূর্তি আসে কোথা থেকে!

সুবিমল মন দিয়ে আজকের ইংরেজি দৈনিকটা পড়ছিল। এখন রাত সাড়ে দশটা। খবরের কাগজ এই বাড়িতে সকালে সাতটা সোয়া সাতটার মধ্যে দিয়ে যায়। তখন সুবিমলের যে ঘুম ভাঙে না তা নয়। ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙলে কী হবে, ঘুম ভাঙা মানেই তো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা। সবে সুবিমলের রক্তে সুগার এসেছে। ডাক্তার বলেছেন একটা দুটো মিষ্টি তবুও চলতে পারে, কিন্তু চায়ে চিনি একেবারে নয়। একথা সুবিমলের বউ শ্রীলেখাও জানে। কিন্তু সাতসকালে চায়ের জন্যে তাড়া লাগালে ঘুম চোখে চায়ে চিনি দিয়ে দেবে। এই নিয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে সুবিমলের উষ্ণ কথপোকথন হয়ে গেছে কয়েক বার। তাতে ঘটনা কিছু পাল্টায়নি। এই ভুল শ্রীলেখা আবার করেছে। আবার উষ্ণ কথপোকথন। তাই সুবিমল ঠিক করে নিয়েছে চা বানানোটা সেই নিয়ে নেবে। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া চা বানানোতে কোনও ঝকমারি নেই। আর সুবিমলের খুব চায়ের নেশা। সকালে অফিসে বেরনোর আগে পেল্লাই কাপে বার তিনেক চাই-ই চাই। রান্নার মাঝখানে বার বার চা বানানোর অনুরোধ করলে শ্রীলেখা বিরক্ত হত। এইসব কিছু মাথায় রেখে চা তৈরি করাটা হয়ে উঠেছে সুবিমলের প্রথম কাজ। নিজের তৈরি চায়ে চুমুক দিতে দিতেই মেয়ের স্কুল বাস আসার সময় হয়ে যায়। পিউকে অবশ্য স্কুলে পাঠানোর জন্যে শ্রীলেখাই তৈরি করে। কিন্তু বড় রাস্তার মোড়ে

গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসতে হয় সুবিমলকেই। তারপরে বাজারে। কয়েক মাস যাবৎ এদিকে যে হারে লোডশেডিং হচ্ছে তাতে যে দু-তিনদিনের বাজার করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবে তার উপায় নেই। ফিরেই বাথরুমে ছোটা। সুগারের ওষুধের জন্যে কি না কে জানে আজকাল বাথরুম পটি করতে খুব সময় যায়। তারপর স্নান সেরে নাক দিয়ে কান দিয়ে ভাত ঢুকিয়ে অফিসের জন্যে বাস ধরতে ছোটা। এর মাঝখানে খবরের কাগজ পড়বে কখন! সে তো লাফ মেরে চলন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসে ওঠার মতো ঘটনা।

তাই অফিস থেকে ফিরে রাতে খেতে যাওয়ার আগে এই আধঘণ্টা সময়টাকে খবরের কাগজ পড়ার জন্যে নির্দিষ্ট করেছে সুবিমল। কানের কাছে কোনও ধরনের কথা জাস্ট সহ্য করতে পারে না। এমন কি পিউকেও বলা আছে পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনও কথা থাকলে রবিবার বলবি। শ্রীলেখাকে নিয়ে এই সময়টাতে অবশ্য কোনও সমস্যা হয় না। কারণ এই সময়ে হিন্দি হোক কি বাংলা হোক, কোনও না কোনও চ্যানেলের সিরিয়াল ওকে গ্রাস করে নেয়। সেখানে আজ যে কী হয়েছে কে জানে। টিভিতে সিরিয়াল যথারীতি চলছে। ওদিকেই শ্রীলেখার চোখ, কিন্তু সিরিয়াল যেন ওকে পেটে পুরে ফেলতে পারেনি। সিরিয়ালের গলায় যেন আটকে আছে। টিভির দিক থেকে মাঝে মধ্যেই চোখ সরিয়ে খবরের কাগজ পাঠরত সুবিমলের দিকে তাকাচ্ছে। আর এক একটা তথ্য দিয়ে চলেছে।

শেষ যে তথ্যটা দিয়েছে তার আগে বলেছে, জানো তো এক একদিন ঘড়িতে এক এক রঙের ব্যান্ড লাগাবে।

সুবিমল শুনেছে। কোনও উত্তর দেয়নি। কারণ মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ত হওয়ার দুটো কারণ। এক তার খবরের কাগজ পড়ায় খুবই ব্যাঘাত ঘটছে। দুই ব্যাপারটা খুব একটা নতুন নয়। এই ধরনের ঘড়ি মেয়েদের সাজগোজের জিনিস। বিক্রি হয় যে সব দোকানে, গিফট আইটেমের দোকানে প্রায় কমন আইটেম। ডায়াল একটা কিন্তু ছ'রঙের ছটা ব্যান্ড থাকে সেটের বাক্সে। পিউয়ের জন্যে কসমেটিক্সের দোকানে গিয়ে সুমিবল এটা দেখেছে। পিউ বায়না করেছিল, সুবিমল কিনে দিতে চায়নি। শ্রীলেখা পরে মেয়ের জন্যে কিনে এনেছে। বছর খানেক আগে থেকে পিউ এই ঘড়ি ব্যবহার করছে। এর মধ্যে সেকথা ভুলে গেল শ্রী! এতো কথার মধ্যে না গিয়ে সুবিমল বিরক্তির সঙ্গে খবরের কাগজটা খচমচ করে সরিয়ে রেখে বলল,

এই মেয়েটা যদি ওরকম ঘড়ি পরে তাতে তোমার অসুবিধা কোথায়?

আহা অসুবিধার কী আছে! ব্যাপারটা কীরকম বেমানান না! অস্বাভাবিক না! জানো ওর বাবার লাঙ ক্যানসার, লাস্ট স্টেজ, দুবার কেমো হয়ে গেছে...

সুমিবল দু-চার মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল শ্রীলেখার দিকে। তারপর অবাক হয়ে বলল, তুমি মেয়েটার ব্যাপারে এত কিছু জেনে গেছ! কখন জানলে! কীভাবে জানলে?

শ্রীলেখা চোখ বড় বড় করে বলল, ও বাবা তুমি এমন করে বলছ যেন এসব জানার জন্যে সিবিআই ইন্সপেক্টর হতে হয়!

সিবিআই ইন্সপেক্টরও তোমার কাছে হার মানবে...

সুবিমলের একথায় শ্রীলেখা আহ্লাদে হাসি হেসে উঠল। যেন সুবিমল খুব বড় প্রশংসা করে ফেলেছে তার। হাসি সামলে দম নিয়ে বলল, সারাটা দুপুর বোর কাটে, কত আর সিরিয়াল দেখব, খাওয়ার পরে ব্যালকনিতে গিয়ে তো একটু বসি, সে তো তুমি জানোই, আর ও ওই সময়টাতেই বেরবে...

বেরলই বা, তাই বলে তোমায় কথা বলতে হবে!

ও মা সামনের বাড়িতেই ভাড়া এসেছে। দিনের মধ্যে কতবার ওকে দেখছি, চোখাচুখি হচ্ছে, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসেও তা কথা বলব না...

আমি বলেছি কথা বলো না! কিন্তু ওরা যদি কিছু মনে করে...

ওরা মানে?

মানে মুখার্জিদারা, ওদের বাড়িতে ভাড়া এসেছে, ওদের ভাড়াটে, আর ওদের সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক খুব একটা ভাল নয়, ওদের ভাড়াটের সঙ্গে এত কথা বলছো, ওরা যদি অফেনডেড হয়?

অফেনডেড হলে হবে, ভাড়া দিয়েছে, ওকে তো আর কিনে নেয়নি, ওর সঙ্গে কথা বললে মুখার্জিদাদের কী?

আসলে সুবিমল চাইছিল মেয়েটার সঙ্গে কম কথা বলুক শ্রীলেখা। কম কথা বললে ওর সম্পর্কে শ্রীলেখা কম জানতে পারবে, কম জানলে ওর ব্যাপারে কম

সমালোচনা করতে পারবে। লোকের সম্পর্কে বেশি সমালোচনা সহ্য হয় না সুবিমলের। সমালোচনা ব্যাপারটা একটা অ্যালার্জিক ইরাপশন তৈরি করে সুবিমলের ভেতরে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারল না। একরাশ বিরক্তি নিয়ে নীরব থাকল।

এই নীরবতায় যেন উৎসাহ পেল শ্রীলেখা। বলল, মেয়েটা না খুব মিশুকে।

মনে মনে হাসল সুমিবল। ওর এই মিশুকেপনা যে ওর কী ক্ষতি করছে যেদিন জানবে এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু মুখে বলল, তাই...। বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকেছে এবার উত্তর দিতেই হয়, তাই বলল। উত্তর না দিলে যে রাতে খাওয়ার সময়ে রান্নায় বেশি নুন পাবে বা একেবারেই নুন পাবে না সুবিমল।

শ্রীলেখা একগাল হেসে বলল, কিছু কিনলেই একবার আমাকে দেখানো চাই। এই তো পরশুদিন, দুপুরবেলায় বেরচ্ছে, আমি ব্যালকনিতে গামছা মেলছি, হাত তুলে মিডল ফিঙ্গারটা দেখিয়ে বলল, এটা কিনলাম। দূর থেকে ভাল করে বুঝতে পারছি না, কাছে ডাকলাম, দেখি ডায়মন্ড রিং, জিজ্ঞেস করলাম কত পড়ল, বলল বত্রিশ...

মুহূর্ত আগে 'তাই' বলে শ্রীলেখার মন রাখার জন্য জাস্ট তাল দিয়েছিল। এবারেও 'তাই' বলল। কিন্তু এবারেরটা চোখ বড় বড় করে একেবারে চমকে গিয়ে।

শ্রীলেখা আরও চমকে দিয়ে বলল, আবার কি বলল জানো, যে রিংটা পছন্দ করেছিল সেটার দাম একচল্লিশ হাজার, বাবা থার্ড কেমো নেওয়ার জন্যে সামনের সপ্তাহে মুম্বই যাবে তাই খরচা আছে বলে ওটা কিনতে পারেনি।

সুবিমল রীতিমত বিস্মিত এবং নিজের ওপরে কিছুটা রাগান্বিত। এতক্ষণ মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পারছিল না বলে শ্রীলেখার ওপরে রাগ করছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাগজে কী খবর আছে! খবর আছে তো শ্রীলেখার কাছে। বিস্ময়ে তির তির করছে দু ঠোঁট। সুবিমল বলল, তা বত্রিশ আর একচল্লিশের মধ্যে কী এমন তফাৎ! আর বত্রিশ হাজার কি কম হল? এরকম একটা চিকিৎসা চলছে সেখানে এইরকম খরচের মানে!

না টাকাটা সেরকম ফ্যাক্টর নয়। ওর বাড়ি তো শিলচরে, ওখানে ওর বাবার কাঠের ব্যবসা। সারা দেশের নানান জায়গায় ওঁর কাছ থেকে কাঠ যায়। আর এখন তো কাঠ হল সোনার ওপরে।

সে জানি। কর্কশতা ঝড়ে পড়ল সুবিমলের কণ্ঠ থেকে।

তারওপরে সিমেন্টের ব্যবসা আছে, আদার ব্যবসা আছে, আদার ব্যবসা মানে, লরিকে লরি আদা যায় বিভিন্ন জায়গায়, পয়সা আছে বলে চিকিৎসাও করাতে পারছে ভালভাবে, আর মনের জোরও খুব, এখনও নাকি হেঁটে উঠে সব ব্যবসা দেখাশোনা করে, বলছিল, 'মনজিনিস'-এর একটা আউটলেট করবে এবার, যেসব ব্যবসা আছে উনি চলে যাওয়ার পরে তো ওঁর স্ত্রী মানে মেয়েটার মা ব্যবসা চালাতে পারবে না, 'মনজিনিস'-এর দোকানটা থাকলে ওর মা চালাতে পারবে।

তা ও কী করতে আছে, ও বাবার কিছু কিছু ব্যবসা দেখাশোনা করতে পারে তো, আজকাল মেয়েরাও তো বিজনেসে খুব সাকসেসফুল হচ্ছে।

আমিও তো সেকথা বলেছিলাম, ঠোঁট উল্টে বলল, ওসব ব্যবসা ট্যাবসা আমার পোষায় না, আমার ভাল লাগে ফ্যাশন ডিজাইনিং, তার কোর্স করতেই তো কলকাতায় এসেছে...

ফ্যাশন ডিজাইনিঙের কোর্স না হাতি, বাবার পয়সা ওড়াতে কলকাতায় এসেছে, একেবারে শেষ সময়ে বাবা যখন বিছানা নেবে তখন তো বাড়ির লোকেদের সেবা শুশ্রূষার দরকার পড়বে, কলকাতায় থাকলে সেটা এড়ানো যাবে বুঝছ না।

শ্রীলেখা কোনও উত্তর দিল না। মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। মন চলে গেছে টিভিস্ক্রিনে। সিরিয়ালের ক্লাইম্যাক্স এখন।

সুবিমল বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কি শুনছো আমার কথা।

টিভির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই শ্রীলেখা বলল, শুনছি তো।

বলছিলাম, এখন যদি ও শিলচর যেত বাবাকে তো কিছুদিনের জন্যে হলেও পেত, এটাই তো ওর এই জীবনের এক মাত্র অ্যাসেট হয়ে থাকত।

এবার টিভির দিক তেকে মুখ ফেরাল শ্রীলেখা। সুবিমলের দিকে রাগত চোখে তাকিয়ে বলল, আমি তো তখন তোমায় সেই কথাই বলছিলাম, যার বাবার ক্যানসার তার মনে এত ফূর্তি আসে কোথা থেকে। আর তুমি তো রেগে গেলে...

সুবিমলের মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে শ্রীলেখা যখন একথা বলছিল, মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে না পারার জন্যে বেশ ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। এখন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা শ্রীলেখার কত গভীরে আঘাত করেছে। কিন্তু কী বা কতে পারে সুবিমল। বা শ্রীলেখা? মেয়েটা তাদের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে পড়ে না, চেনা পরিচিত নয়, সামনের বাড়ির ভাড়াটে মাত্র। উপযাচক হয়ে জ্ঞান দিতে গেলে তাদের নামে না অভিযোগ করে বসে। সে হবে মহা বিপত্তি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুবিমল। তারপর শ্রীলেখার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে বলল, খেতে দাও, কাল আবার তাড়াতাড়ি বেরতে হবে।

দুই

কাল তাড়াতাড়ি বেরতে হবে বলে খেতে চলে গিয়েছিল সুবিমল। কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠল বেশ দেরি করে। তাও এই দেরি করেও ওঠা হত না সুবিমলের, যদি না শ্রীলেখা ঠেলা দিত। পিউ চ্যাঁচামেচি না করত। ধরমড় করে বিছানায় উঠে বসল সুবিমল। পিউ আর শ্রীলেখার চিন্তিত মুখ, কুঞ্চিত কপাল দেখে উদ্বিগ্নতা নিয়ে সুবিমল শুনল, প্রিয়াঙ্কা দরজা খুলছে না।

প্রিয়াঙ্কা? সে কে?

এতো চিন্তার মধ্যেও বেশ বিরক্তি নিয়ে শ্রীলেখা বলল, আরে বাবা সামনের বাড়ির ভাড়াটে মেয়েটা।

বিছানা থেকে নেমে পড়েছে সুবিমল। ঠিক করে নিয়েছে রাতের অবিন্যস্ত পোশাক। বলল, তা আমি কী করব?

মুখার্জিদার স্ত্রী এসেছিল, তোমাকে যেতে বলেছে।

তা আমি গিয়ে কী করব! বাড়িতে মুখার্জিদা নেই?

অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর গেছে।

তাহলে পুলিশে খবর দিতে বলো।

সে তো আছেই, তা তুমি গিয়ে একবার দেখো না।

মুখার্জিদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভাল নয়, সে তো তুমি জানো। তারপর খারাপ কিছু যদি একটা হয় তখন পুলিশি চক্কর, আমাকে ফেঁসে যেতে হবে। মুখার্জিদার স্ত্রী কি তখন আমার পাশে দাঁড়াবে?

আরে বাবা তুমি কি ঘরে ঢুকছো নাকি? ডেকেছে যখন একবার যাও, বাইরে থেকে যতটা সম্ভব দেখো।

সুবিমল, শ্রীলেখার সঙ্গে পিউও চলে এল মুখার্জিদার বাড়িতে। নীচের তলার পুরোটা মেয়েটাকে ভাড়া দেয়নি। পেছন

দিকের একটা ঘর আর অ্যাটাচড বাথ ওকে ভাড়া দিয়েছে। ওদিকে একটা টুকরো বাগান রয়েছে। বাগানে উসকো খুসকো এলো চুলে একরাশ টেনশন মেখে মুখার্জিদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সুবিমলকে দেখে বললেন, কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোনও সাড়াশব্দ নেই। আজ ভাড়া দেবে বলেছিল তাই এসেছিলাম, কী বিপদ বলুন তো...

মুখার্জিদার স্ত্রী-র কথা বলার ঢঙে বোঝাই যাবে না সুবিমলদের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কটা ভাল নয়। সুবিমল ভেতরে ভেতরে একটু অবাক। বিপদ মানুষকে কত কাছে এনে দেয়। কিন্তু এখন ওসব ভাবার সময় নয়। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলোই করল। প্রিয়াঙ্কার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। দরজা ধাক্কা দিল। কোনও বিপদ নেই।

এদিকে বড় বড় দুটো কাঁচের জানলা। কিন্তু ভেতর থেকে ভারী পর্দা টানা। জানলার ওপরে একটা স্কাইলাইট নজরে এল। পুরনো আমলের বাড়ি বলে আছে। আজকাল তো দেখাই যায় না। ওটার কাছে পৌঁছতে পারলে ঘরের ভেতরটা দেখা যাবে। কিন্তু পৌঁছবে কী করে? মুখার্জিদার বউকে বাড়িতে কোনও মই আছে কিনা জিজ্ঞেস করল সুবিমল।

আছে। কিন্তু তিনতলার চিলেকোঠায়। গলদঘর্ম হয়ে সুবিমলই নামিয়ে আনল। জানলার কার্নিশে উঠে পড়ায় স্কাইলাইটটা একেবারে কাছে। কাঠের ফ্রেমের কাঁচটা সমান্তরাল করে দিতে ঘরের ভেতরটা দৃশ্যমান হয়ে উঠল সুবিমলের চোখে। একেবারে বিদেশি সিনেমায় দেখানো একাকিনীর লিভিংরুম। যততত্র আধুনিক পোশাক এলোমেলো হয়ে ছড়ানো। কয়েক জোড়া সুদৃশ্য জুতো। জামাকাপড়ের মতোই এখানে সেখানে পড়ে। এক পাটি সোনালি রঙের হাইহিল তো বিছানায়! খাটের পাশের টেবিলটায় এলইডি স্ক্রিনের একটা কম্পিউটার রয়েছে বটে তবে টেবিলের অধিকাংশটাই দখল করে নিয়েছে পারফিউমের একাধিক শিশি। পাশের চেয়ারের উপরে বড়োসরো পেটমোটা একটা মদের বোতল। তলায় সামান্য পড়ে আছে। আর ঘরের বাসিন্দা একটা জিনসের হাফপ্যান্ট, হাফ স্লিভলেস টিশার্ট পরে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে জীবিত না মৃত বোঝা দুষ্কর।

স্কাইলাইটের নিচে কার্নিশের উপর উবু হয়ে বসে আছে সুবিমল। আর কার্নিশের নীচে বাগানে দাঁড়িয়ে মুখার্জিদার স্ত্রী শ্রীলেখা আর পিউ। শ্রীলেখাকে এক মগ জল নিয়ে আসতে বলল সুবিমল। শ্রীলেখা নিয়ে এল। সেই জল স্কাইলাইটের ফাঁকের মধ্যে ছুঁড়ে দিল সুবিমল।

বিছানার ওপরে উপুর হয়ে থাকা প্রিয়াঙ্কা চিৎকার করে ধড়মড়িয়ে সেকেন্ডেই চিৎ। একরকম আতঙ্ক নিয়ে বলে উঠল, হরিবল ইটস রেনিং ইনসাইড দ্যা রুম!

সুবিমল চেঁচিয়ে বলল, ইটস নট রেনিং কিন্তু তোমার দরজা না খোলাটা খুব পেনিং, দয়া করে দরজাটা খোলো।

প্রিয়াঙ্কার ঘরের দরজা খুলে গেল। এতক্ষণ যারা বাইরে ছিল সবাই প্রিয়াঙ্কার ঘরের মধ্যে। প্রিয়াঙ্কা চেয়ারের ওপরে রাখা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া হুইস্কির বোতলটার দিকে একবার তাকাল। তারপর তাকাল সুবিমলের চোখে। হাল্কা হেসে নিসঙ্কোচে বলল, কাল না একটু ওভার হয়ে গিয়েছিল।

এরকম অকপট স্বীকারোক্তি সুবিমল জীবনে কমই শুনেছে। বিশেষ করে যে বলছে সে তার মেয়ের থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড়। তার ওপরে তার মেয়ে এখন এখানে উপস্থিত। কিছু বলতে পারছে না সুবিমল।

খাটের ওপরে এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা জামাকাপড়ের কয়েকটা সরিয়ে প্রিয়াঙ্কা নিজেই বসল। একগাল হেসে সুবিমলকে বলল, আসলে না কাল অনেক রাত অবধি বাপির সঙ্গে চ্যাট করেছি, আর চ্যাট করতে করতে বুঝতে পারছিলাম বাপি দারুণ এনজয় করছে আমার কলকাতার লাইফটা।

পাশের চেয়ারের উপরে বড়োসরো পেটমোটা একটা মদের বোতল। তলায় সামান্য পড়ে আছে। আর ঘরের বাসিন্দা একটা জিনসের হাফপ্যান্ট, হাফ স্লিভলেস টিশার্ট পরে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে উপুর হয়ে পড়ে আছে।

এবার শ্রীলেখা ওর বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। অস্বাভাবিক রূপে রূঢ় হল, বলল, ওঁর তো ক্যানসার, উনি আবার এনজয় কী করবেন?

প্রিয়াঙ্কা রাগল না, স্নিগ্ধ হেসে বলল, আপনি তো সব জানেনই। কিন্তু একটা কথা জানেন না, মানে আপনাকে বলা হয়নি, আমি তো খুব সাজতে ভালবাসি, খুব ফূর্তিতে থাকতে ভালবাসি। আসলে শিলচরে আমি আমার মতো করে থাকতে পারছিলাম না, বাপির অসুখটা ধরা পড়ার পরে ওখানে বাপির চারপাশে আমরা যারা ছিলাম প্রত্যেকেই আনন্দ করাটা বন্ধ করে দিই, প্রত্যেকের মনে হয়েছে বাপির চোখের সামনে আনন্দ করাটা অন্যায়। শুধু আমি বুঝেছিলাম আমাদের আনন্দ করা বন্ধ হওয়ায় বাপি দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। বাপিকে যেন বেশি বেশি করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাপি অসুস্থ। বাপি আর বেশিদিন নেই। কিন্তু কলকাতায় আসার পরে আমার এই সাজগোজ, আমার ফ্যাশান শো, ডিজাইনিঙের সেমিনার—এই সব কিছুর ছবি রেগুলার পোস্ট করেছি, আর সেটা যে বাপিকে কতটা চার্জ করেছে, কতোটা আনন্দ দিয়েছে কাল চ্যাট করতে করতে বুঝতে পারছিলাম। সেলিব্রেট না করে পারিনি। একা একাই সেলিব্রেট করেছি। অনেকটা খেয়ে ফেলেছিলাম আঙ্কেল।

সুবিমল দেখল হাল্কা হয়ে সুখের জল ভেসে উঠেছে প্রিয়াঙ্কার দু-চোখের রেখায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটার মুখের দিকে। সাজগোজের এমন কারণ তো সে জীবনে শোনেনি। আর এটাও মনে হল এই জীবনে শুনবেও না। এতো সাজগোজ নয়। এতো প্রাণের যজ্ঞ মৃত্যু পথের পথিককে সামান্য প্রাণ উপহার দেওয়া। মাথা নিচু করে নিল সুবিমল। আর মনে মনে বলল, ও সাজুক আরও সাজুক আর ওর এই সাজের ছবি ও বারবার পোস্ট করুক ওর বাপিকে।

একটি ভালবাসার গল্প

প্রচেত গুপ্ত

কথা ও কাহিনি-৫

Suvida

প্রচেত গুপ্ত

এই ভালবাসার গল্প কি আমরা কেউ জানি? এই গল্প কি আমাদের চেনা? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। কিন্তু গল্পের শেষ? তাও কি আমাদের চেনা? না, চেনা নয়। ভালবাসার মতোই গল্পের শেষ বদলে বদলে যায়। এই গল্পেও তাই হয়েছে। চেনা জীবন অচেনা হয়ে যায়। গল্পও তাই। আমরা যারা গল্পের ভিতর থাকি না, গল্পের চারপাশে ঘুরে বেড়াই তারা চমকে উঠি। ভয় করে। শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় ঠাণ্ডা স্রোত। আমার ভালবাসাও কি তবে এমন? এমন করেই বদলে বদলে যায়?

যাক গল্পে আসি। তবে এবার আর অন্য কাউকে নয়, ভালবাসাকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাই। শেষ কি তবু অচেনা? খবরটা এতদিন চাপা ছিল। এখন অফিসে ছড়িয়ে পড়েছে।

যদিও খবরটা আমি অফিস থেকে জানিনি। জেনেছি শনিবার রাতে। অর্থাৎ পরশু। সোমবার পর্যন্ত পেটের মধ্যে খবর হাসফাঁস করেছে। কলিকে বলে যে খানিকটা হালকা হব সে উপায় ছিল না। আমি সবকথা আমার বউকে বলি। একদল পুরুষমানুষ আছে, যারা বউকে সব কথা জানায় না। আমি তেমন নই। আমি কলিকে ভালবাসি। তাকে কিছু লুকোতে আমার ভিতর খচ খচ করে। এই পর্যন্ত শুনে কেউ মনে করতে পারে, আমার আর কলির বিয়ে হয়েছে প্রেম করে। একেবারেই নয়। আমাদের সম্বন্ধ বিয়ে।

বিয়ের পর কলি আমাকে বলেছিল, 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি বলব কী করে! এই তো সবে বিয়ে হল?'

কলি আমার গালে হাত বুলিয়ে বলল, 'ভালবাসা বুঝতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগে না। একটা মুহূর্তই যথেষ্ট। বল তো কার লেখা?'

আমি বললাম, 'জানি না। কার লেখা।'

কলি বলল, 'পরে বলব। তবে তোমাকে আমি ভালবাসা বোঝবার কতগুলো টেকনিক বলে দিই। যদি বোঝ, আমাকে তোমার সব কথা বলে ফেলবার ইচ্ছা হচ্ছে, তাহলে জানবে তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছো।'

কলির টেকনিক যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি আমার বউকে ভালবেসে ফেলেছি।

কলি আমাদের বুটিকে নিয়ে পুরুলিয়ায় বাপের বাড়ি গেছে। তার বাবার শরীর ভাল নয়, কটাদিন সেখানে আছে। বাপের বাড়িতে থাকার সময় সে আমার ফোন পছন্দ করে না।

'কটাদিনের জন্য বাবা-মায়ের কাছে এসেছি, তখনও যদি টেলিফোন করে ঘাড়ের ওপর পড়ে থাকো তাহলে তো আসবার মানেই হয় না। এক কাজ কর, ব্যাগ গুছিয়ে চলে এসো। কদিন ঘরজামাই থেকে যাও। তোমার মধ্যে ঘরজামাই হবার যথেষ্ট গুণ রয়েছে।'

এই খোঁচার পর আর ফোন করা যায়? তবু শনিবার আমি কলিকে তিনবার ফোন করেছি। একবার রান্নারমাসির কামাইয়ের খবর বলতে, একবার ফ্রিজের হাঁ থেকে আবিষ্কার হওয়া একবাটি ভাত কদিনের বাসি জানতে এবং তৃতীয়বার মেয়ের লেখাপড়ার বিষয়ে কিছু পরামর্শ করবার ছিল। অঙ্কটা যখন গোলমাল করছে তখন আর একজন প্রাইভেট টিউটর রাখা উচিত কিনা সেই বিষয়ে পরামর্শ। শেষবারের ফোনে কলি খুবই বিরক্ত হয়। ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তুমি কি চাও আমি এখনই বুটির হাত ধরে ফিরে যাই?'

আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি তো দরকারেই ফোন করছি। গল্প করার জন্য তো করিনি। রান্নারমাসি দুম করে কামাই করলে সমস্যা হবে না? বাধ্য হয়ে ফ্রিজে রাখা ভাতের খোঁজ নিচ্ছিলাম। বাসি পচা যা-ই হোক খেতে হবে তো কিছু।'

কলি বলল, 'দুটো দিন নিজে সামলে নিতে পারছো না? বাড়িতে খাবার দরকার কী? অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে। আর শোনো, ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের জন্য সাবজেক্ট পিছু দু'জন করে প্রাইভেট টিউটর রাখব কি না সেটা নিয়ে না হয় কদিন পরে ক্লোজ ডোর মিটিঙে বসব। আমি ফেরবার পর। দয়া করে এখন আমাকে ফোন করবে না।'

এরপর আর কলিকে ফোন করবার প্রশ্নই ওঠে না। এই খবর বলার জন্য তো একেবারেই নয়। কলি কোনওরকম গসিপ, কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, পরনিন্দা সহ্য করতে পারে না। গসিপের কারণে ফিল্ম ম্যাগাজিনগুলো পড়ে না। রাতে শোয়ার পর আমার

মনে হল, আচ্ছা, এই ভয়ংকর খবর কি কেচ্ছা কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়ে? নাকি অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে সেটা কী? মহান?

রবিবার সকালে পর পর দু'কাপ চা খাওয়ার পর আমি দেখলাম, এরকম একটা খবর একা নিয়ে বসে থাকা কঠিন। অফিসের কয়েকজনকে জানানো দরকার। অন্তত ঘনিষ্ঠ যারা। শ্যামল, বিকাশ, ঘোষদা, অঞ্জনবাবুর মতো যাদের সঙ্গে রোজ টিফিনে গল্পগুজব, চা-সিগারেট খাই তাদের বলা যেতেই পারে। তাছাড়া খবর আদৌ সত্যি কিনা তাও যাচাই করা উচিত। এসব ব্যাপারে শ্যামল করিৎকর্মা ছেলে। ঠিক লতাপাতায় যোগাযোগ বের করে ফেলবে। হয়তো দুদিন সময় নেবে, কিন্তু খবরটা ভাল না মন্দ, কেলেঙ্কারি না মহান— সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার। একা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। টেলিফোনের রিসিভার তুলে শ্যামলকে ডায়াল করতে গিয়েও থমকে গেলাম। বাধো বাধো ঠেকছে। টেলিফোনে এসব নিয়ে আলোচনা ঠিক হবে? শ্যামল পরে হাসাহাসি করবে না তো? করতেই পারে। শ্যামল ছেলেটা ফাজিল। নির্বিকার মুখে অশ্লীল কথা বলতে পারে। এরপরেও হয়তো বলবে। বলবে, 'বিনয় এই খবরে রস পেয়েছে। সকাল থেকে সেই রসে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর একে তাকে ফোন করছিল।' না, থাক। এসবের মধ্যে ঢুকে লাভ নেই। খবর কেচ্ছা, কেলেঙ্কারি, ভাল, মন্দ, মহান যাই-হোক না কেন আঁশটে গন্ধ আছে। নিজে থেকে ঘাঁটাঘাটি না করাই বুদ্ধিমানের। আমি ঠিক করলাম, কাউকে কিছু বলব না। যদি কেউ জানতে চায় নিজে থেকে জানবে। সবারই খবর জানার লোক আছে। কে জানে, এতক্ষণে হয়তো অফিসে কেউ কেউ জেনেও ফেলেছে। কয়েকজন কি আর ওই সময়ে ছিল না? নেমন্তন্ন পায়নি? এত পরিচিত মানুষ... । লুকিয়ে চুরিয়ে তো কিছু হয়নি। ঢাকঢোল পিটিয়েই হয়েছে। খবর ভয়ংকর বলে হয়তো তারাও চেপে আছে। অতএব চুপ করে থাকাটাই ভাল। আমি চুপ থাকবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপ থাকতে পারলাম না।

সব জায়গাতেই কিছু কিছু 'খবর উৎসাহী' মানুষ থাকে। সাধারণ খবরে এদের কোনও উৎসাহ নেই, উৎসাহ শুধু গোপন খবরে। গোপন খবরের গন্ধ পেলে এদের চোখ চকচক করে ওঠে। কান খাড়া হয়ে যায়। চশমা নাকের ওপর ঝুলে পড়ে। এরা তখন ঝুলে পড়া চশমার ওপর দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যেন শুধু কান নয়, চোখ, নাক, মুখ সব দিয়েই খবর শুনছে! একটা শব্দকেও পাশ কাটাতে দেবে না। খবর শুনতে শুনতেই প্রতিজ্ঞা করে, কাউকে বলা যাবে না। মেরে ফেললেও নয়। সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে না। 'গোপন খবর' চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে অতি দ্রুত। 'খবর উৎসাহী' মানুষদের আরও গুণ থাকে। গোপন খবর ছড়ানোর সময় মূল খবরের সঙ্গে এরা শাখাপ্রশাখাও যুক্ত করতে থাকে। একটা সময়ের পর খবরের কোন অংশ সত্য, কোনটা বানানো আলাদা করা যায় না। এই অফিসের শান্তা পাল তেমনই একজন মানুষ। আমি তার কাছেই প্রথম খবর ফাঁস করলাম। যদিও তাকে 'খবর' জানানোর পিছনে আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। শান্তা পাল পাশের টেবিলে বসেন। অফিসে ঢুকে প্রথমে তার সঙ্গেই টুকটাক কথা হয়। কেমন আছেন? উফ্ কী গরম! কাল ঠিক মতো বাস পেয়েছিলেন? নাতির পেটের অসুখ কেমন? উচ্ছের দাম শুনেছেন? ছেলের ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট ভাল হয়নি। ছেলে মেয়ে মানুষ করা যেকী কঠিন— ধরনের হালকাপলকা সব কথা। আজ সেসবের বদলে আমি দুম করে অন্য কথা বলে বসলাম। সম্ভবত প্রায় দুদিন চেপে রাখবার পর নিজেকে সামলাতে পারিনি। মধ্যবিত্তের অসুখ।

আমি শনিবার এই 'খবর' শুনছি ক্লাবে। অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলা মাঝে মধ্যে সেই ক্লাবে যাই। কলির আপত্তি আছে, মুখে কিছু বলে না। অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ছেলেকে পড়িয়ে, টিভি দেখে, বই উল্টে নিজের মতো সময় কাটায়। ক্লাবে তাস খেলা চলে। সঙ্গে আড্ডা। আড্ডার কোনও নির্দিষ্ট বিষয় থাকে না। নেতাদের রাজনীতি থেকে অভিনেতাদের কেচ্ছা সব থাকে। যেদিন যার স্টকে যেমন থাকে। শনিবার স্টক থেকে 'খবর' বের করে সবাইকে চমকে দিল আদিত্য। বলার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই খবরের সঙ্গে বিনয়দার একজন চেনা মানুষ জড়িয়ে আছে। উনি বিনয়দার কলিগ ছিলেন। নাম উদয়। উদয় সেন।'

আদিত্যর কথা শুনে প্রথমটায় থতমত খেয়ে যাই। বলি, 'কী খবর?'

আদিত্য গলা নামিয়ে, চোখ নাচিয়ে খবরটা বলে। আমি চমকে উঠি। উদয়বাবু এই কাজ করেছেন! আমার মতো অন্যরাও চমকে ওঠে। যদিও তারা উদয়বাবু কে চেনে না। কিন্তু খবরটা চমকে ওঠবার মতোই। এ তো খবর নয়, গল্প উপন্যাসের মতো। সিনেমা থিয়েটারে দেখা যায়।

আমি বললাম, 'তুমি জানলে কী করে? খবর সত্যি?'

আদিত্য বলল, 'বাঃ, আমি জানব না! হুগলির ওই গ্রামে আমার এক দূরসম্পর্কের শালী থাকে। ওখানকার সবাই জানে। কলকাতার লোকও জানে। বরযাত্রী গিয়েছিল। বরযাত্রীদের জন্য প্রথমে বাস ভাড়া করা হয়েছিল। পরে ঘটনা শুনে অনেকেই পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটো গাড়ি। তোমাদের উদয় সেনগুপ্তকে সেদিনও নাকি তাঁর আত্মীয়রা সাবধান করে। বলেছিল, আরেকবার ভেবে দেখুন। ওই ভদ্রলোক তখন বলেন, ভাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ছেলে যখন রাজি হয়েছে, ব্যস্ আমার আর ভাবার কিছু নেই।'

এই পর্যন্ত বলে আদিত্য থামল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উদয় সেনগুপ্ত তোমার অফিসের লোক, অথচ তুমি এতবড় একটা খবর জানো না!'

আমার প্রেস্টিজে লাগল। ভুরু কুঁচকে বললাম, 'উনি এখন আর অফিসের লোক নন, ছিলেন। এক বছর হল রিটায়ার করেছেন।'

আদিত্য জিভ দিয়ে 'চুক চুক' আওয়াজ করে বলল, 'ওই হল। এক বছর আর এমনকী সময়? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই? নেমন্তন্ন করেনি?'

আমি হাতের মেলে ধরা তাসে মন দিতে দিতে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'না। আমার সঙ্গে তেমন খাতির ছিল না। আর কাউকে করে থাকতে পারে, আমি জানি না।'

আদিত্য অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে মেয়েটার সাহস আছে। হিম্মৎ একেই বলে। লুকোয়নি। যা করবার বলেকয়েই করেছে। সে তার পাস্ট চেপে যেতে পারত।'

আমি বললাম, 'মানে! বলে কয়ে করেছে মানে?'

আদিত্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মানে আর কী, বিয়ের আগেই তার হবু বরকে সব জানিয়েছে। ছেলেও তো চেপে যেতে পারত। যে মেয়ের অতীত জীবন অমন... ঢাক পিটিয়ে বলবার কী ছিল?'

তড়িৎদা বললেন, 'ও বেচারি কী করবে? দরিদ্র পরিবার... আমাদের দেশে অমন আকছাড়... তাছাড়া জন্মের সময় মা মারা যায়, মাসির বাড়িতে চলে গিয়েছিল। ... তুমিই তো বললে আদিত্য।'

বিক্রম বলল, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি পারতে

আদিত্য? যদি তোমার ছেলে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করব বলে বায়না করত? পারতে তুমি? বা তুমি নিজে পারতে বিয়ে করতে।'

আদিত্য বিরক্ত গলায় বলল, 'আমার প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে?'

মতিবাবু ফিচ আওয়াজে হেসে বললেন, 'তা ঠিক। আমাদের বেলায় এসব প্রশ্ন আসবে কেন? আমরা সব দেখে শুনে বিচার করে কাজ করি আর মুখরোচক গল্প করি। নাও গল্প ছেড়ে খেলায় মন দাও।'

আমি খেলায় মন দিতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে ছটফট করতে লাগলাম। এত বড় একটা ঘটনা! সোমবার অফিসে ঢুকে আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। পাশের টেবিলের দিকে ঝুঁকে, নিচু গলায় বললাম, 'শান্তাদি, ঘটনা আপনি কিছু জানেন নাকি?'

শান্ত পাল কাজ শুরুর আগে ফাইল গোছাচ্ছিলেন। মুখ তুলে, নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমা তুলতে তুলতে বললেন, 'কোন ঘটনা?'

আমি আরও গলা নামিয়ে বললাম, 'উদয়বাবুর ছেলের ঘটনা? শুনেছেন কিছু?'

শান্তা পাল ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'কী বলছো বুঝতে পারছি না। উদয়বাবু মানে? কোন উদয়বাবু? সেনগুপ্তদা? আমাদের পারচেজে ছিল?'

আমি মাথা নাড়লাম। শান্তা পাল বললেন, 'তার আবার কী হল? অসুখ বিসুখ? নিয়মমানা খিটখিটে লোক, বাইরের খাবার ছুঁত না, ফোটানো জল খেত, তার অসুখ হবে কীভাবে!'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তার কিছু হয়নি। তার ছেলের হয়েছে।'

শান্তা পাল সোজা হয়ে বসলেন। তার চোখ চকচক করছে আমার ভঙ্গি দেখে তিনি গোপন খবরের গন্ধ পেলেন। গলা নামিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে ছেলের?'

'বিয়ে।'

'বিয়ে! পালিয়ে? উদয়বাবুর মতো অমন একটা কড়া টাইপের লোকের ছেলে পালিয়ে বিয়ে করল?'

আমি বুঝতে পারলাম শান্তাদি নিজের মতো করে গল্প সাজাতে শুরু করেছে।

আমি আশপাশে তাকিয়ে বললাম, 'না না পালিয়ে টালিয়ে নয়। উদয়বাবু ছেলের বিয়ে দিয়েছে যে মেয়েটির সঙ্গে সে... সে...।'

কথাটা শেষ করবার পর শান্তা পাল সোজা হয়ে বসলেন। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। ধাতস্থ হতে সময় নিলেন। তারপর গলা তুলে বললেন, 'ছি ছি। মাগো। আজকালকার ছেলেপুলোগুলোর সব কী রুচি! ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে... এই সব মেয়ের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করেছে! ছ্যা। বাবা-মাকে ফাঁসাচ্ছে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আস্তে বলুন শান্তাদি। সবাই শুনতে পাবে। তাছাড়া, শুনেছি ভাব ভালবাসার বিয়ে নয়। সম্বন্ধের বিয়ে। মেয়ে দেখে ছেলের পছন্দ হয়েছিল, বাবাও আপত্তি করেনি। পরে মেয়ে নাকি ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে যোগাযোগ করে। নিজের পাস্ট জানায়। বলে, বিয়ে করবার দরকার নেই। ছেলে এই কথা শুনে ওই মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। বাবাকে সব জানিয়ে বলে, এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

শান্তা পাল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'খুব খারাপ। খুব নোংরা। মেয়েটা ফাঁদেও ফেলেছে। উদয়বাবুর ছেলে রঙ ঢঙ দেখে ভুল করেছে। তাবলে বাবা-মা আটকাবে না? উদয়বাবু তো নরম সরম লোক নন। কড়া লোক। ঘরে একটা ইয়ে পুত্রবধূ আনার কী দরকার ছিল?'

শান্তা পাল ঘটনায় কেচ্ছা খুঁজে পেয়েছেন। তাতে পাক দিতেও শুরু করেছেন। আমার হালকা লাগছে। যাক ঘটনা একজনকে বলা গেছে। নইলে হাঁসফাঁস করে মারাই যেতাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে শান্তাদি ছেড়ে দিন। যার যা মনে চায়।'

শান্তাদি ধমক দিয়ে বললেন, 'আমি কী আর ধরতে গিয়েছি? পুরুষমানুষের যে কতরকম ভীমরতি হয়... ছি ছি...।'

আমি খানিকটা অনুরোধের ঢঙে বললাম, 'কথাটা আর কাউকে বলার দরকার নেই।'

শান্তা পাল ফাইল খুলতে খুলতে ঘেন্না পাওয়া গলায়, 'এটা বলবার মতো একটা ঘটনা হল? ছি ছি। সকালে এসেই কী যে একটা খবর শোনালে বিনয়!'

অফিসে খবর ছড়াল। তবে শান্তা পালের মাধ্যমে নয়। উদয় সেনের ডিপার্টমেন্টের দু'জন তার ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। অফিসার বিজয়বাবু আর পিওন জগদীশ। দুজনের সঙ্গেই উদয়বাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। এটাই স্বাভাবিক। একবছর আগে যিনি চলে গেছেন, তিনি তো আর অফিসের তিনশো কর্মীকে নেমন্তন্ন করতে পারেন না। জগদীশ তেমন কিছু না বললেও, বিজয়বাবু আজ সবটা বলে দিলেন।

উদয়বাবু সব শোনবার পর নাকি ছেলেকে বলেছিলেন, 'এই মেয়ের কোনও দোষ নেই। মেয়েটি অনেস্ট এবং জীবনের যে কোনও বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। আমার ভাল লাগছে যে তুমি সেটা বুঝতে পেরেছো।'

ইচ্ছে করলে উদয়বাবু আর তার ছেলে ঘটনা গোপন করতে পারতেন। করেননি। নিজেরা বলে না বেড়ালেও যারা জানতে

তখন আমার কত বয়স... চোদ্দ ... দু-এক মাস বেশি...। আমি জামশেদপুরে দিদিমার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম...। একদিন দুপুরে ছাদরে ঘরে গিয়েছি... সেখানে দেখি দীপকদা... দীপকদা ওই বাড়িতে থাকত... দিদিমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়... কলেজে পড়ত... আমার যে কী হল...

পেরেছে, তাদের কাছে অস্বীকার করেনি। আত্মীয়স্বজনরা সকলেই বিয়েতে আপত্তি করে। উদয়বাবুকে বলে, 'ছেলেকে আটকান। জীবনটা সিনেমা নয়। হঠাৎ উত্তেজনা একটা সময় শান্ত হয়ে যাবে। তখন অনুশোচনা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। তাছাড়া, সমাজ বলে একটা কথা আছে। সমাজ বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে যেতে চায় না। সে রিফিউজ করে। তাছাড়া এই সব খবর গোপন থাকে না। তখন মুখ দেখানো মুশকিল হবে।' উদয়বাবু এসব কথা কানে তোলেননি। এমনকি ছেলের মায়ের আপত্তিও নয়। ছেলের কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বুক ফুলিয়ে বিয়ে দিয়ে ঘরে পুত্রবধূ এনেছেন।

গোটা অফিস বিস্মিত। টেবিলে টেবিলে আলোচনা। বেশিরভাগই বলছে, বাড়াবাড়ি হয়েছে। পরে পস্তাতে হবে। এই মেয়েকে নিয় উদয়বাবুরা বেশিদিন সংসার করতে পারবেন না। জানাজানির পর সবাই কৌতূহল দেখাবে। ওই মেয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাবে। সেই তাকানো গায়ে বিঁধবে।

টিফিনের সময় এক কাণ্ড হল। আমার সঙ্গে অ্যাকাউন্টসের ঘোষবাবুর ঝগড়া লেগে গেল। ঘোষবাবুর সঙ্গে যোগ দিল শ্যামল, চিন্ময় সেন, অলক, মাধবী কুণ্ডু। ক্যান্টিনে বসে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। ঘোষবাবু বললেন, 'উদয়ন কাজটা বাজে করল। নিজে মহৎ হতে গিয়ে ছেলেকে ডোবালো।'

আমি বললাম, 'ডোবানোর কী আছে? ছেলে তো আর ছোটো নয়। নিজে বুঝে শুনেই বিয়ে করেছে।'

ঘোষবাবু বললেন, 'উদয়ন যে কবে নারী উদ্ধারে নামল কে জানে! তা বাবা নিজের ঘর দিয়ে শুরু করলি কেন?'

আমি বললাম, 'ঠিকই করেছে। সাহস দেখিয়েছে।'

শ্যামল বলল, 'অফিসে তো মেনিমুখো হয়ে থাকত।'

আমি বললাম, 'কে কবে কোথায় সাহস দেখাবে কে বলতে পারে।'

মাধবী কুণ্ডু সাজপোশাকে আধুনিক। রোজ লিপস্টিক লাগিয়ে অফিসে আসেন। বললেন, 'মেয়েটার নিশ্চয় কোনও মতলব আছে। সেন্টিমেন্ট দেখিয়ে মালদার বর জোগাড় করেছে। উদয়দার ছেলে ভাল চাকরি করে।'

চিন্ময় সেন কম কথার মানুষ। চুপ করে থাকতেই পছন্দ করেন। আজ করলেন না। বললেন, 'ওই মেয়ের কী লজ্জাশরমও নেই!'

অলক বলল, 'আহা লজ্জা শরম থাকলে চলবে কেন! আপনি বুঝতে পারছেন না, এসব মেয়ে নানাভাবে নিজেদের সেল করতে চায়। লাইম লাইটে আসতে চায়।'

ঘোষবাবু মুখ দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের অবজ্ঞার আওয়াজ করে বললেন, 'তাছাড়া আবার কী, দেখবেন কবে টিভি ক্যামেরার সামনে বরকে নিয়ে বসে গেছে। ইন্টারভিউ দিচ্ছে। আমাদের উদয় সেনকেও হয়তো উঁকি মারতে দেখা যাবে।'

আমার মাথায় দুম করে আগুন জ্বলে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষবাবুর দিকে আঙুল তুলে বললাম, 'চুপ করুন। একদম চুপ করুন। না জেনেশুনে একটা মেয়েকে অপমান করবেন না। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে উদয়বাবুর ছেলে এবং তিনি যে স্ট্যাণ্ড নিয়েছেন তার জন্য আপনাদের গর্ব হওয়া উচিত। কার এমন সাহস হবে? হবে আপনার? সুযোগ হলে ওই ছেলেকে আমিও বুকে জড়িয়ে ধরতাম। মেয়েটিকে স্যালুট জানাতে হয়। নিজের ঘটনার কথা লুকিয়ে না রেখে ঠিক করেছে। কাউকে ঠকায়নি। ও তো কোনও অন্যায় করেনি। যারা অন্যায় করেছে অপরাধ তাদের। আমার তো মনে হয়, এই মেয়ে সবার সামনে একটা এক্সাম্পেল হয়ে রইল। যে মেয়েদের ওপর এরকম হয় তারা সব বলে দিলে আমাদের মতো কাপুরুষদের মুখে কালি পড়বে। তাছাড়া সেও সঠিক ছেলেকেই জীবনে খুঁজে পেয়েছে। ভাল ছেলে বাড়ি, গাড়ি, চাকরি বেতন দিয়ে মাপা যায় না। আপনারা এসব বুঝবেন না। মিডলক্লাস মেনটালিটির মানুষ।'

কথা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম বাকিদের হতভম্ব করে গটগটিয়ে ক্যান্টিন ছাড়লাম। নিজের টেবিলে আসবার পর বুঝলাম মনটা ভাল হয়ে গেছে। হালকাও। আমিও তাহলে অন্যায় কথার প্রতিবাদ করতে পারি। বাঃ। কলিকে সব বলতে হবে। কলি খুব খুশি হবে। মন দিয়ে কাজ শুরু করলাম।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে চমকে যাই। কলি ফিরে এসেছে। রান্নার মাসি ফোন করে জানিয়েছে তার ছেলের ডেঙ্গি। আগামী কয়েকদিন আসতে পারবে না। এই অবস্থায় আমাকে রেখে সে কী করে বাইরে থাকবে? এই না হলে ভালবাসা? আমি খুব খুশি হলাম। মেয়েকে আড়াল করে চুমু খেলাম।

'তোমার অনারে আজ ক্লাবে যাব না কলি। আজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে গল্প করব। তারপর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আদর করব।'

কলি মুখ টিপে হেসে বলল, 'অসভ্য একটা।' তারপর আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'কী গল্প। মেয়ের প্রাইভেট টিউটর নিয়ে গল্প।'

আমি আমার বউয়ের হাত ধরে হেসে বললাম, 'না। একটা ভয়ংকর গল্প বলব। আগেই বলব ভেবেছিলাম। ভরসা পাইনি। এখন পাচ্ছি। অফিসে সবার নাক ঘষে দেবার পর।'

ড্রইংরুমের সোফায় বসে কলি চুপ করে গোটা ঘটনাটা শুনল। আমার ঝগড়া পর্যন্ত। তারপর চুপ করে উঠে রান্না করতে গেল। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কলি কি রেগে গেল? কী হল?

কী হল জানতে পারলাম রাতে। আমি কলিকে কাছে টানবার পর।

কলি থমথমে গলায় বলে, 'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলব।'

আমি অধৈর্য বললাম, 'এখন কোনও কথা না। এখন শুধু উঃ উঃ... অ্যাই নাইটিটা খোল... । বাপ্‌রে মাত্র তিনটে দিন, মনে হচ্ছে তিনমাস... ।'

কলি বলল, 'আগে আমার কথাটা শোনও।'

'কাল শুনব কলি।'

কলি বিড় বিড় করে বলল, 'না আজই বলব। সময় হয়েছে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

আমি হতাশ গলায় বললাম, 'আচ্ছা বলো। চট করে বলবে।'

কলি ফিস ফিস করে বলতে শুরু কল।

'তখন আমার কত বয়স... চোদ্দ ... দু-এক মাস বেশি... । আমি জামশেদপুরে দিদিমার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম... । একদিন দুপুরে ছাদরে ঘরে গিয়েছি... সেখানে দেখি দীপকদা... দীপকদা ওই বাড়িতে থাকত... দিদিমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়... কলেজে পড়ত... আমার যে কী হল... দীপকদাকে তখন মনে হত রাজপুত্র... আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম... তারপর... তারপর... কলকাতায় এসে মা লুকিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি করল... উপায় ছিল না...'

কলির কথা শেষ হয়েছে। আমার শরীর ঝিমঝিম করছে। খাট থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে বেসিন ভাসিয়ে বমি করলাম।

কলিকে ডিভোর্স করব। সে কথা তাকে জানিয়েও দিয়েছি। আমি আমার বউকে যে খুব ভালবাসি। তাকে কোনও কথা লুকোয়নি।

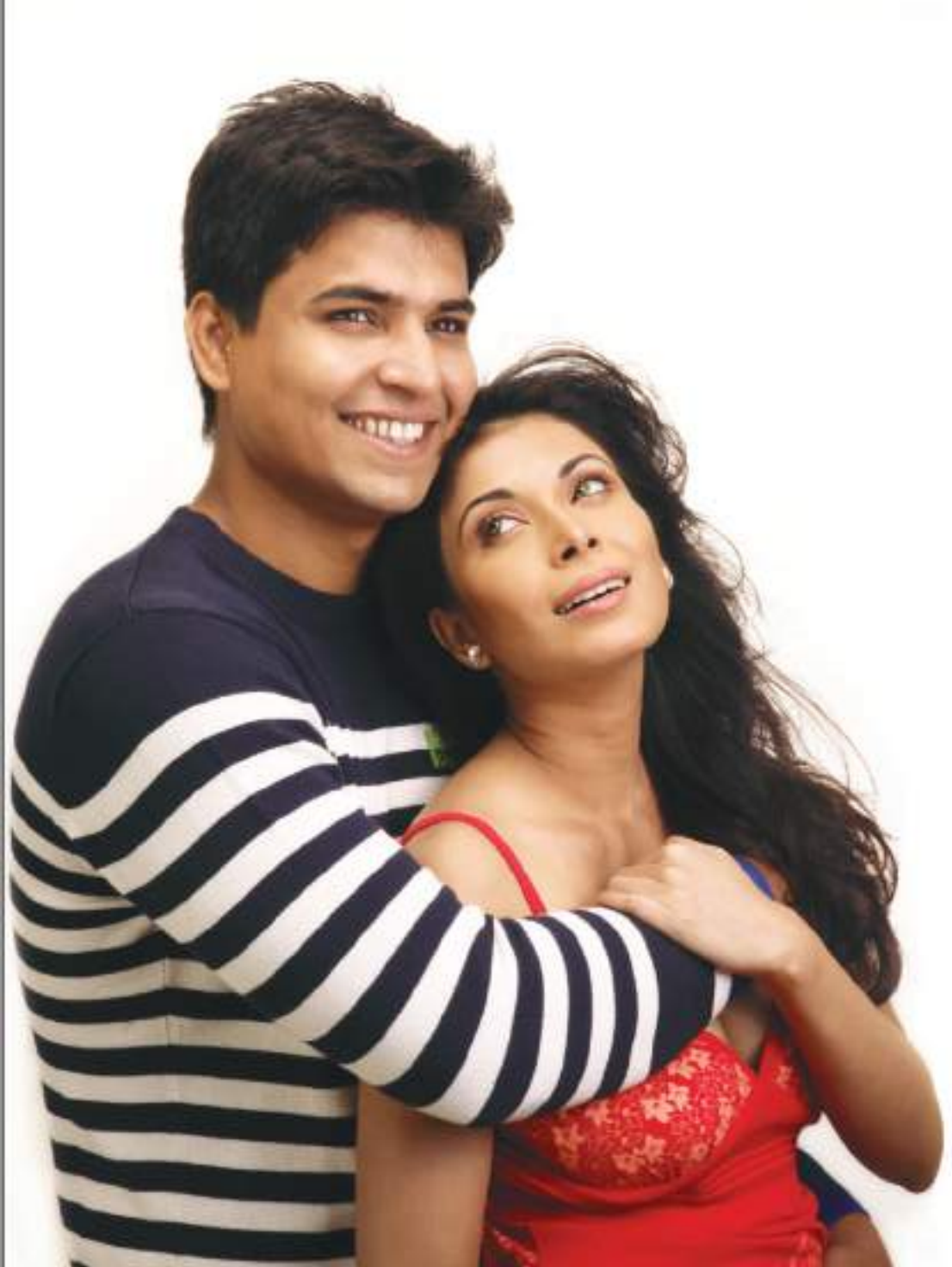

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®
Connecting hearts naturally

গর্ভনিরোধক বড়ি

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।